সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ
দমনে
ইসলাম
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম

মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী
সার্বিক সহযোগিতায় ঃ রাফীক বিন সাঈদী
অনুলেখক ঃ আব্দুস সালাম মিতুল
প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০৫
প্রকাশক ঃ গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক
৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ শিবলী-শাকিল কম্পিউটার
৪৩৫/এ-২ মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
প্রচ্ছদ ঃ কোবা কম্পিউটার এন্ড এ্যাডভারটাইজিং
৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মুদ্রণ ঃ আল আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলা বাজার-ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ ৪০ টাকা মাত্র

Shantrash O Zonggibad Damone Islam by Moulana Delawar Hossain Sayedee, Co-Operated by Rafeeq Bin Sayedee, Transliteration : Abdus Salam Mitul, Published by Global Publishing network. 66 Paridhash Road, Banglabazer, Dhaka-1100, Frist Edition : 2005 December, Price : 40 TK Only in BD, 2 Doller in USA, 1 Pound in UK.

যা বলতে চেয়েছি

বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশসহ আমাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশেও যখনই সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদী কর্মকান্ড ঘটছে, তখনই ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের দিকে আঙ্গুলি সংকেত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে 'আল্লাহর আইন চালু'র ধুয়া তুলে একশ্রেণীর বিপথগামী লোক স্কুল-কলেজ, যান-বাহন, রাষ্ট্রীয় স্থাপনাসমূহ ও আদালতকে টার্গেট করে আত্মঘাতী বোমা হামলা করছে। আদালতের কি এ ক্ষমতা রয়েছে যে তারা আইন পরিবর্তন করবে? আদালত তো আইন প্রয়োগ করে মাত্র। আইন পরিবর্তন ও প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে পার্লামেন্ট। আর পার্লামেন্ট গঠিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তারাই সংসদের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের রায়ে আইন প্রণয়ন বা পরিবর্তন করতে পারে।

আল্লাহর আইন চালুর নামে বর্তমানে যারা সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী বোমা হামলা করছে, তারা তাদের দাবির প্রতি আন্তরিক হলে নির্বাচনের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে তারা প্রচলিত আইন পরিবর্তন করতে পারতো। যেহেতু তারা তাদের দাবির আন্তরিক নয় এবং আল্লাহর আইন চালু করাও তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়, তাই তারা গণতান্ত্রিক পথে না গিয়ে সন্ত্রাস ও আত্মঘাতী বোমাবাজী করে ইসলাম-ইসলামী আন্দোলন ও বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা বিনষ্ট করার এক গভীর ষড়যন্ত্র নিয়ে মাঠে নেমেছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট।

সাম্প্রতিককালে দেশব্যাপী লক্ষ্য করা যাচ্ছে একশ্রেণীর লোক দেয়ালে দেয়ালে লিখছে, 'গণতন্ত্র, নির্বাচন, ভোট, পার্লামেন্ট' ইত্যাদি হারাম। এগুলো যদি হারাম হয় তাহলে সরকার পরিবর্তন কিভাবে হবে সে পদ্ধতিও জাতির সামনে পেশ করা হচ্ছে না। গণতান্ত্রিক এসব ব্যবস্থা 'হারাম' বলে যারা ফতোয়া দিচ্ছে তারাও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতি, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মদদদাতা কিনা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

'আল্লাহর আইন চালু'র দাবিতে যারা সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে আদালতে হামলা চালাচ্ছে, তারা তাদের দাবি স্বাভাবিক পন্থায় আদায়ের জন্য এ পর্যন্ত কোথাও মিছিল-সমাবেশ করে দেশের জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছে কিনা তা কারো নজরে আসেনি। বরং বোমাবাজির মাধ্যমে 'আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন' মুসলমানদের প্রাণের এই দাবিকেই সন্দেহ-সংশয় ও সন্ত্রাসবাদের মোড়কে আচ্ছাদিত করার অপচেষ্টা করছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে।

অপরদিকে সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলেই এর সাথে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের যোগসূত্র আবিষ্কারের ব্যর্থ চেষ্টাও সচেতন মহলের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইসলামপন্থীরা এদেশে কচুড়ি পানার মতো ভেসে আসা কোনো গোষ্ঠী নয়, এদেশের মাটির অনেক গভীরে এদের শিকড় প্রোথিত এবং মানুষের সাথে রয়েছে আত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। আল্লাহভীরু এসব

লোকদেরকে সাধারণ মানুষের কাছে 'বিতর্কিত' করে তোলার অপচেষ্টাও সচেতন মহলের দৃষ্টি-সীমায় রয়েছে। শুধু তাই নয়, খোদ বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে 'অকার্যকর ও ব্যর্থ রাষ্ট্র' হিসেবে প্রমাণ করে আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। রাষ্ট্রের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো বিচার বিভাগ। ইসলাম ও দেশের শত্রুরা বিচার বিভাগকে ধ্বংস করে দেশকে সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্যে পরিণত করে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করছে।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, বোমা হামলার ঘটনা ঘটলেই সরকারের পদত্যাগের দাবি তোলা হয়। আমেরিকার প্রাণ 'পেন্টাগনে' হামলা হলো, ভারতের পার্লামেন্ট ভবনে হামলা হলো এবং ২০০৫ সালের ১৩ই নভেম্বর নকশালরা ভারতের অঙ্গরাজ্য বিহার প্রদেশের জেহানাবাদ শহরের গোটা প্রশাসন অচল করে দিয়ে, শহরটি দখলে নিয়ে ২০ জনকে হত্যা করলো এবং তাদের ৪০০ শত সহযোদ্ধাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করে নিয়ে গেলো। দিল্লীর বিপনী কেন্দ্রে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সন্ত্রাসীরা ৬০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করলো, এসব ঘটনার কারণে সেদেশে কেউ সরকারের পদত্যাগের দাবি তোলেনি বা হরতাল ডাকেনি। ২০০১ সালের অগাস্ট মাসের পূর্বে যারা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো, তখন যেসব বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেময়ও এসব চিহ্নিত লোক তৎকালীন সরকারের পদত্যাগের দাবি তোলেনি বা হরতাল আহ্বান করেনি। সম্মিলিতভাবে উদ্ভূত সমস্যার মোকাবেলা না করে বর্তমানে সরকারের পদত্যাগের দাবি তোলার বিষয়টিও সচেতন মহল তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছে।

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামের সাথে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের যোগসূত্র আবিষ্কারের ঘৃণ্য চেষ্টা। সন্ত্রাসী কারা, কী উদ্দেশ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইসলামপন্থীদের ওপর দোষ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং কেনোই বা 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে, সময়ের দাবি অনুযায়ী উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ সম্মুখে রেখেই আমি এই ক্ষুদ্র পরিসরে বিশ্বে সন্ত্রাসের জনক ও তাদের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

সেই সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের ব্যাপারে ইসলামের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিও পবিত্র কোরআন হাদীস, নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনী থেকে তুলে ধরেছি। আশা করি, এই আলোচনা ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের সম্পর্কে 'শত্রুসৃষ্ট' অপপ্রচার দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং না বুঝে অজ্ঞতার কারণে যারা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে, তারাও নিজেদের ভুল অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে সত্য অনুধাবনে তাওফীক দিন এবং প্রকৃত সত্য সকলের সম্মুখে স্পষ্ট করে দিন।

আল্লাহর অনুগ্রহের একান্ত মুখাপেক্ষী

সাঈদী

০৯/১২/২০০৫

আলোচ্যসূচী

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا-وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا-

কোনো মানুষকে হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি বিধান) ছাড়া (অন্য কোনো কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করলো; (আবার এমনিভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিলো। (সূরা মায়িদা-৩২)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিনে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিচার করা হবে, তা তাদের মধ্যে সংঘটিত রক্তপাত ও হত্যার বিচার। (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যেখানে কোনে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, সেখানে যেনো কেউ উপস্থিত না থাকে। কারণ এ হত্যাকান্ডের সময় যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না, তার ওপরও অভিশাপ অবতীর্ণ হবে। (বায়হাকী)

আত্মহত্যা সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করলো, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে চিরদিনই পড়ে থাকবে। কখনোই সেখান থেকে মুক্তি পাবে না। যে লোক বিষ পান করে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামের আগুনে চিরকালই নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোনো অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামে চিরকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজেকে আঘাত করতে থাকবে। (বোখারী, মুসলিম)

সন্ত্রাসবাদ

বর্তমান পৃথিবীতে এমন একটি দেশ নেই, যে দেশ এবং দেশের জনগণ সন্ত্রাস নামক দানবের আতঙ্কে আতঙ্কিত নয়। প্রত্যেকটি দেশেই সন্ত্রাস ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। সন্ত্রাস নামক দানবের ভীতিকর পদচারণা কম-বেশী পৃথিবীর প্রত্যেক জনপদেই অনুভূত হচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ প্রতিহিংসা চরিতার্থের পর্যায়ে উপনীত হয়ে যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস বিস্তৃত হচ্ছে, তেমনি নানা মতবাদ মতাদর্শে বিশ্বাসী এক শ্রেণীর লোকজন সাংগঠনিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংঘটিত করছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষ যেমন নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছে, তেমনি সামষ্টিকভাবেও মানুষ নিরাপত্তাহীনতার শিকার। নির্বিঘ্নে শঙ্কামুক্ত পরিবেশে কোনো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষ একত্রিত হতে আতঙ্কবোধ করছে।

কর্মস্থল, ভ্রমণস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সভা-সমাবেশ, দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যাতায়াতের বাহন, বিপনী কেন্দ্র ও চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্রসমূহ এবং অন্যান্য জনসমাগমের স্থানসহ এমন একটি স্থানও নেই, যেখানে মানুষ সন্ত্রাস আতঙ্কে তাড়িত হচ্ছে না। ভ্রান্ত বিশ্বাস ও উগ্র মতবাদ-মতাদর্শের অনুসারীরা সরকারী স্থাপনা, ধর্মীয়স্থান, বিদেশী দুতাবাস, সচিবালয়, রাজনৈতিক কার্যালয়, বিচারালয়, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, শপিং সেন্টার, গ্যাস ও তৈল ক্ষেত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ এবং জনসমাগম স্থলকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালিত করে ব্যাপক প্রাণহানী এবং মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নাইজেরিয়ায় আমেরিকান দুতাবাসে, ভারতের পার্লামেন্ট ভবনসহ বিভিন্ন স্থানে, আমেরিকার টুইন টাওয়ারে, বৃটেনের পাতাল রেলে, তুরস্কের বিভিন্ন বিপনী কেন্দ্রে, ফ্রান্সের রেলওয়ে স্টেশনে, জর্ডানের পাঁচ তারকা হোটেলে, পাকিস্তানের ধর্মীয় উপাসনালয়সহ বিভিন্ন স্থানে, সউদী আরবের বিভিন্ন স্থানে, মিশরে শপিং সেন্টারে, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্থানের বিভিন্ন স্থানে, বাংলাদেশে আদালতে, ধর্মীয় উপাসনালয়ে, রাজনৈতিক কার্যালয় এবং সমাবেশে ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে অগণিত মানুষ হত্যা করা হয়েছে, মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে ও অসংখ্য মানুষকে চিরতরে পঙ্গু বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসী ঘটনার মাধ্যমেই এশিয়া মহাদেশে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হককে ও ইরানের পার্লামেন্টে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলী রেজাই, কয়েকজন মন্ত্রী ও পার্লামেন্টের সদস্যসহ ৮০ জনকে। এ ছাড়া গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দিয়ে বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতাকে ইরানে হত্যা করা হয়েছে। ফিলিপাইনের জননন্দিত প্রেসিডেন্ট বেনিনগো

একুইনোকেও সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। শ্রীলঙ্কার জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট রানা সিংহে প্রেমাদাসাকে প্রাণ দিতে হয়েছে বোমাবাজদের হাতে। লেবাননের সাবেক প্রেসিডেন্ট রফিক হারিরীকেও সন্ত্রাসীদের হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিষফোড়া ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রবিনও সন্ত্রাসী ইয়াহূদী তরুণের হাতে নিহত হয়েছেন। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনও সন্ত্রাসী কর্তৃক গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্য স্বাধীনতা বা স্বাধিকার আন্দোলন করছে। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ও স্বাধীন খালিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এর নেতৃত্ব দিতে থাকে আকালী দলের মাধ্যমে শিখ নেতা হরচান্দ সিং লাঙ্গোয়াল ও সুরজিত সিং বার্ণালা। শিখদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সান্ত জর্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে পাল্টা উপদল সৃষ্টি করা হয়। ভারত সরকার এই উপদলকে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদেরকে হত্যা করার জন্য এদেরকে অস্ত্র দিয়েও সজ্জিত করে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'।

কিন্তু শিখদের উপদলের নেতা সান্ত জর্নাল সিং এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, শিখদের পবিত্র স্থান অমৃতস্বরের 'স্বর্ণ' মন্দিরকে কেন্দ্র করে তারা এক বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করে এবং সারা ভারতব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে থাকে। এদেরকে যে ভারত সরকার সৃষ্টি করেছিলো, তারাই অবশেষে কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে 'স্বর্ণ' মন্দিরের অভ্যন্তরেই দলবলসহ সান্ত জর্নাল সিংকে হত্যা করে। এরই পরিণতিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও শিখদেরই হাতে প্রাণ হারাতে হয়।

শ্রীলঙ্কাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলেই শ্রীলঙ্কার তামিল গেরিলাদের প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ভারতের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তামিল গেরিলারা গোটা শ্রীলঙ্কা জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর বড় পুত্র রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পরে তিনি যখন শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রীয় সফরে যান, তখন গার্ড অব অর্নার গ্রহণকালে এক সৈনিক তার মাথা লক্ষ্য করে রাইফেলের ব্যাটন দিয়ে আঘাত করে। সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেও সেই তামিল গেরিলাদের হাতেই শেষ পর্যন্ত তিনিও তার মায়ের অনুরূপ পরিণতি ভোগ করেন। সন্ত্রাস নামক যে দানবকে ইন্দিরা-রাজিব গান্ধী দুধ-কলা দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট করেছিলেন, সেই দানবের ছোবলেই মাতা-পুত্রকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ভারতের জনক বলে খ্যাত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে প্রথমে ১৯৩৪ সালে ২৫শে জুন পুনে শহরে রেল স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যার

চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়বার ১৯৪৬ সালে ঐ একই পদ্ধতিতে জুন মাসে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী তৃতীয়বার হত্যার চেষ্টা করে মদনলাল নামক এক সন্ত্রাসী। এর মাত্র ১০ দিন পরে ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে নামক এক সন্ত্রাসীর হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও সন্ত্রাসীদের হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের অন্যতম ঘৃণ্য নীতি হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে নানা ধরনের উপদল সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে অস্থির করে রাখা। ১৯৭১ সালের বহু পূর্ব থেকেই ভারত আওয়ামী লীগকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট করতে থাকে। ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হলো, আওয়ামী লীগ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারত সরকার অত্যন্ত গোপনে দেরাডুনে আরেকটি উপদল গঠন করে। এদেরকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে। এরা নানা ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অবশেষে ঐ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দাবিদার দলের নেতৃত্বেই সন্ত্রাসী কায়দায় ভারতের কুটনীতিক সমর দাসকে অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়।

অনুরূপভাবে পরাশক্তি আমেরিকা সউদী আরবের সরকারকে অস্থির রাখার লক্ষ্যে সউদী ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। লাদেন পরিবারের সাথে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার পিতা সিনিয়র বুশের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো এবং তাদের মধ্যে শত মিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিলো। লাদেনকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আমেরিকা সৃষ্টি করলো আল কায়েদা সংগঠন। এরপর তাদেরকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে সউদী সরকারকে অস্থির করে তোলা হলো। এক পর্যায়ে তাদের মাধ্যমে পবিত্র কা'বাঘরও দখল করিয়ে পবিত্র স্থানে রক্তপাত ঘটানো হলো।

তৎকালীন পরাশক্তি অখন্ড রাশিয়া আফগানিস্থান দখল করার পরে বিন লাদেনকে আমেরিকা প্রচুর সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত করে আফগানিস্থানে টেনে এনে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড় করালো। রুশ বাহিনী আফগানিস্থান ত্যাগ করার পরে আমেরিকা ও বিন লাদেনের 'মধুচন্দ্রিমায়' ফাটল ধরলো এবং লাদেনকে উপলক্ষ্য করেই আফগানিস্থান ও ইরাকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে দেশ দুটো দখল করে অগণিত মুসলমানকে হত্যা করলো। সেই হত্যার ধারাবাহিকতায় এখনও প্রতিদিন সে দেশ দুটোয় প্রাণহানী ঘটছে। আমেরিকা বিন লাদেন অধ্যায়ের যবনিকা এখানেই

ঘটায়নি, নিজেদের স্বার্থে সৃষ্টি আল কায়েদাকে উপলক্ষ্য করে ইরান, সিরিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে ব্যাপক প্রাণহানী ঘটানোর পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করে এনেছে।

পরাশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের স্বার্থে সৃষ্ট নানা ধরনের জঙ্গী সংগঠনকে অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। বর্তমানে এই সন্ত্রাস এতটাই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনেই চরম এক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। শান্তিপ্রিয় মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ, সে স্থান দখল করেছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর যেখানেই সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেখানেই মুসলমানদের সাথে এই ঘৃণ্য কর্মের যোগসুত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে সিন্ডিকেট সংবাদে একমাত্র মুসলমানদের দিকেই আঙ্গুল তুলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, মুসলমানরাই এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের নামের সাথে সাথে সন্ত্রাসের প্রতি অসহিষ্ণু সর্বোত্তম জীবন বিধান পবিত্র ইসলামের নাম যুক্ত করে বলা হচ্ছে, ইসলামী উগ্রবাদী ও ইসলামী মৌলবাদীরাই সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এভাবে সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেয়-প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কিন্তু কেনো এই সন্ত্রাস, কি এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রকৃত সন্ত্রাসী কারা, জঙ্গীবাদী দল কারা সৃষ্টি করছে, ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাসী তৎপরতায় মুসলিম নামধারী লোকদেরকে কেনো ব্যবহার করা হচ্ছে, সন্ত্রাসের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কেনোই বা ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, এসব বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেক সচেতন মানুষেরই স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আশা করি পরবর্তী ইতিহাস ভিত্তিক তাত্ত্বিক আলোচনা পাঠ করলে সকলের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম-মুসলমান বনাম সন্ত্রাসবাদ

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আইন অনুসরণের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পদ্ধতি দিয়েছেন। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টির জন্য তাঁর আইন পালন বাধ্যতামূলক করেছেন। চিন্তাবিদগণ সাধারণ দৃষ্টিতে যা বুঝেন তা হলো, তিনি যদি অন্যান্য সকল সৃষ্টির জন্য তাঁর আইন অনুসরণ বাধ্যতামূলক না করতেন, তাহলে মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। যেমন মহাশূন্যে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নিহারীকাপুঞ্জ, ব্লাকহোল ও অন্যান্য যা কিছুই রয়েছে, এসব কিছুর পরিভ্রমণের জন্য গতিপথ বা পরিভ্রমণের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এসব পথে ওগুলো চলতে বাধ্য। ওসব সৃষ্টিসমূহের পরিভ্রমণের

পথে আল্লাহ তা'য়ালা যদি স্বাধীনতা দিতেন, তাহলে পরিভ্রমণের পথে একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ছিলো অবশ্যম্ভাবী এবং সেগুলো স্বয়ং যেমন ধ্বংস হতো তেমনি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতো।

অপরদিকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আইন পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র মানুষকেই স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং সতর্ক করে দিয়ে পবিত্র কোরআনে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, 'আলো-অন্ধকারের পথ বা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেয়া হয়েছে।' কেউ ইচ্ছে করলে আলোর পথ বা সত্যপথ অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে, এ স্বাধীনতা যেমন মানুষের রয়েছে তেমনি সে অন্ধকার পথ অনুসরণ করে পৃথিবী ও আখিরাতে নিজেকে ধ্বংসও করে দিতে পারে, এ স্বাধীনতাও মানুষের রয়েছে। একই সাথে মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানব মন্ডলীকে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'ইসলামই মানুষের জন্য একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।'

সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শ কেউ যদি অনুসরণ করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে পৃথিবী ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করবে, শান্তি, স্বস্তি ও সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে তার জন্য আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা অবশ্যই বাধ্যতামূলক। আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করে কেউ যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তার সে দাবির কানাকড়িরও মূল্য নেই। কারণ 'মুসলিম ও ইসলাম' এই শব্দ দুটো একটির সাথে আরেকটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত, পরস্পর সম্পূরক এবং অবিচ্ছিন্ন। এই শব্দ দুটোর মূলেই নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রগতি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের বিভীষিকামুক্ত শঙ্কাহীন এক উন্নত জীবন-যাপনের পরিবেশ।

'ছিলমুন' শব্দ থেকে 'ইসলাম' শব্দের উৎপত্তি এবং এর অর্থ হলো শান্তি। আর মুসলিম শব্দের অর্থ 'আত্মসমর্পণকারী'। আল্লাহ তা'য়ালা মানবমন্ডলীর শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও শঙ্কামুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ যে বিধানাবলী দান করেছেন, এর সমষ্টির নামই হলো ইসলাম এবং এই বিধানাবলীর নিকট যে মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে বা নিঃশর্তে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়ে অনুসরণ করেছে, সে-ই হলো মুসলমান।

সহজ কথায় সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের বিপরীতে শান্তি, স্বস্তি, উন্নতি ও নিরাপত্তা দানের নিশ্চয়তামূলক বিধানের নিকট যে মানুষ তার সমগ্র সত্তাকে সমর্পণ করেছে, সেই হলো মুসলমান। এ কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তির হাত ও মুখের কথা থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি মুসলমান নয়।'

যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের নিরাপত্তার প্রতীক ও শান্তির নিশ্চয়তামূলক জীবন বিধান ইসলামকেই মানুষের জন্য একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন, সেই আল্লাহ তা'য়ালার নিরানব্বইটি নামের মধ্যে গুণবাচক নামসমূহের একটি নাম হলো 'সালাম' অর্থাৎ শান্তিদাতা। অপরদিকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে 'সালাম' নামের অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়ায় ঘোষণা করেছেন, 'হে নবী! আপনাকে আমি সমগ্র জগতের জন্য করুণার প্রতীক হিসেবেই প্রেরণ করেছি।'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'করুণার প্রতীক তথা নবীয়ে রহমত' উপাধি দান করেছেন। তাহলে বিষয়টি এভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, 'শান্তিদাতা' সালাম আল্লাহ তা'য়ালা সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের বিপরীতে 'শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি-প্রগতি ও শঙ্কামুক্ত জীবন বিধান শান্তির আদর্শ ইসলামকে' করুণার মূর্তপ্রতীক নবীয়ে রহমতের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি এ সর্বোত্তম আদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামায শেষ করার আদেশও দিয়েছেন শান্তি কামনা করার মাধ্যমে। অর্থাৎ নামাযের শেষ বৈঠকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্' মুখে উচ্চারণ করেই নামায শেষ করতে হবে। নামায শেষ করেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে যে দোয়া করতেন সে দোয়ার অর্থ হলো, 'হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান-কল্যাণময়! তোমার কাছেই আমি শান্তির শেষ আশ্রয়স্থল জান্নাত কামনা করছি।' আল্লাহর রাসূলের শিখানো এই দোয়া অধিকাংশ আলেমগণ নামায শেষ করেই তিলাওয়াত করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে যারা এই দোয়া মুখস্থ করেছেন তারাও করে থাকেন।

এরপর মুসলমানদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হলেও শান্তি কামনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ আচ্ছালামু আলাইকুম, 'তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' প্রথমে বলে তারপর অন্যান্য কুশলাদি জানতে হবে। পৃথিবীতে মানব শিশু আগমন করার সাথে সাথে তাকে সালাম জানাতে হবে, শিশুর বাকশক্তি নেই, সে জবাব দিতে পারবে না তবুও তাকে সালাম জানাতে হবে অর্থাৎ তার জন্য শান্তি কামনা করতে হবে। মানুষ ইন্তেকাল করলে জানাযা আদায় করার সকল দোয়াসমূহেও মৃতের জন্য শান্তি কামনা করতে হয় এবং জানাযা শেষও করতে হয় 'আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ' বলে অর্থাৎ শান্তি কামনা করে। মুসলমানদের কবর দেখলেই বা জিয়ারত করার সময়ও প্রথমে কবরবাসীকে সালাম জানাতে হয় এবং কবর জিয়ারতের অন্যান্য সকল দোয়ার মধ্যেও শান্তি কামনা করা হয়।

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বয়ং কা'বাস্থান-দোয়া কবুলের স্থানে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ আর জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন- اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে মালিক! এ শহরকে তুমি শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। (সূরা বাকারা-১২৬)

যে জাতির পিতা স্বয়ং সন্ত্রাসবাদ আর জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, সেই জাতি কি সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদে নিজেদেরকে জড়াতে পারে? ইসলাম মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সহজ-সরল শান্তির পথ কামনা করতে শিক্ষা দিয়েছে। নামায আদায়কারী ব্যক্তিগণ প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বারবার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে থাকেন। এই সূরার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করতে থাকেন- اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তুমি আমাদের সরল ও অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও। (সূরা ফাতিহা)

যে মুসলমান প্রত্যেক দিন ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযেই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে ৩২ বার মহান আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে আবেদন করছে, 'আমাদেরকে সহজ-সরল পথ দেখাও।' সেই মুসলমানের পক্ষে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী তৎপরতার পথে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব? প্রকৃত মুসলমানদের সাথে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের ঐ দূরত্ব রয়েছে, যে দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রয়েছে। ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে, তারা না জেনে অথবা ইসলামের দুশমনদের হাতের পুতুল হিসেবেই চালাচ্ছে। বলা বাহুল্য, ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বদনাম করার লক্ষ্যেই শত্রুপক্ষ মুসলিম নামধারী এসব লোককে ব্যবহার করছে।

ইসলামের ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর প্রত্যেক পরিসরে ও মুসলিম জীবনের সূচনা এবং সমাপ্তি তথা দুনিয়া-আখিরাতের সবস্থানে শুধু শান্তি কামনা ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে, সেই ইসলামে সন্ত্রাসবাদ আর জঙ্গীবাদের গন্ধ অনুসন্ধান করা, 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে মানুষ হত্যা করা, দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করা একমাত্র মূর্খ, জাহিল, জ্ঞানপাপী, ইসলাম-মুসলমান ও দেশের শত্রুদেরই কাজ হতে পারে। আর যারা নিজেকে মুসলমান দাবি করে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের পথ অনুসরণ করে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, তারা স্পষ্টই ভ্রান্ত পথের অনুসারী এবং এ পথ গিয়েছে জাহান্নামে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এসব লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ.

তাদেরকে যখনই বলা হয়েছে, 'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না' তখনই তারা বলেছে, 'আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।' (সূরা বাকারা-১১)

সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদ নির্ভর পথ অনুসরণ করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ হত্যাকারীদের যখন বলা হচ্ছে, 'তোমরা কেনো এই বিপর্যয় সৃষ্টি করছো, তারা জবাব দিচ্ছে, 'আমরা আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য এই কাজ করেছি। অর্থাৎ অশান্তি সৃষ্টিকারী অন্য সকল আইন বাতিল করে আল্লাহর শান্তিময় আইন কায়েম করার লক্ষ্যেই এসব কাজ করছি।'

এসব মূর্খ-জাহিলরাই যে প্রকৃত অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, এই চেতনাই এদের মধ্যে নেই। এসব চেতনাহীন দুষ্কৃতিকারীদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلاَّ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ-

সাবধান! প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু এর কোনো চেতনাই তাদের নেই। (সূরা বাকারা-১২)

ইসলামের দুশমন কর্তৃক বিভ্রান্ত হয়ে বোমাবাজ মানুষ হত্যাকারী সন্ত্রাসীরা ইসলামের নামে দেশে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে এবং নিজেকে যে নবীর উম্মত তথা অনুসারী হিসেবে দাবি করছে, সেই নবীয়ে রহমত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।' 'নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।' 'তুমিই সবথেকে সহজ-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

যে মহামানবকে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা 'সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ও করুণার মূর্ত প্রতীক' হিসেবে সনদ দিয়েছেন, সেই মহামানবের অনুসারী হিসেবে নিজেকে দাবি করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অন্য মানুষকে ও নিজেকে হত্যা করে 'জান্নাতে যাবার' প্রলোভন যারা দেখাচ্ছে, তাদের পরিচয়, তারা ইসলাম-মুসলমান, দেশ-জাতি ও সমগ্র মানবতার দুশমন। সচেতন মহলের চোখগুলোকে সিসি টিভিতে পরিণত করে এদেরকে ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে এবং এদের ওপর কোরআন ঘোষিত বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সাথে সম্পর্কিত সর্বোচ্চ দন্ড প্রয়োগ করাই বর্তমানে সময়ের দাবি।

রোযা ও পূজার দেশে সন্ত্রাসী সৃষ্টির কৌশল

আল্লাহর আইন চালুর নামে যেসব মুসলিম নামধারী কিশোর, তরুণ ও যুবকদের ব্যবহার করা হচ্ছে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে এরা প্রায় সকলেই হতদরিদ্র পরিবারের মূর্খ, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কর্মহীন-বেকার, ভবঘুরে, হতাশাগ্রস্ত, অর্থলোভী এবং বুদ্ধি-বিবেচনাহীন সদস্য। এদের কাছে অর্থই মূখ্য

বিষয়। ইসলাম-মুসলমান, দেশ-জাতি ও মানবতার দুশমনরা এসব মোটা মাথার লোকদেরই রিক্রুট করে আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এসব লোকের মাধ্যমে তাদের পরিবারকে কিছু অর্থ সরবরাহ করে পরিবারের অন্য সকল সদস্যকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা বেশ লাভজনক কর্মেই জড়িত রয়েছে। এরপর এসব লোকদেরকে ক্রমশ নিজ পিতামাতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্য সকল সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে 'পেশাধারী সম্মোহনকারী' আমদানী করে এদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, এদের মধ্যে থেকে মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহের মৃত্যু ঘটিয়ে হৃদয়কে করা হয়েছে মায়া-মমতাশূন্য। পিতামাতা, ভাইবোন দূরে থাক– নিজ জীবনের প্রতিও এমন বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, 'নিজ জীবনকে নিজের কাছেই এক দুর্বহ বোঝা' এই অনুভূতি এদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'জীবন নামক দুর্বহ এই বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেহেশ্‌তে যাবার সবথেকে সহজ পদ্ধতি হলো আল্লাহর আইন চালু'র জন্য অন্য মানুষ ও নিজেকে হত্যা করা।' কোরআন-হাদীসের জ্ঞান বিবর্জিত বুদ্ধি-বিবেচনাহীন জাহিল এসব লোকদেরকে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি বিদ্রোহী করে গড়া হয়েছে। সুস্থ চিন্তার পরিবর্তে এদের মাথায় প্রবেশ করানো হয়েছে অসুস্থ চিন্তা। অর্থাৎ এরা জীবন সম্পর্কে হতাশা ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া লোক। এসব লোকদের প্রতি আমাদের করুণা হয়।

গোয়েন্দাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এসব লোক দীর্ঘ দিন যাবৎ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে, কেউ কেউ বছরে মাত্র দু'একবার এসে পিতামাতা বা পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে কিছু টাকা দিয়েই আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদেরকে নিজ পরিবার, সমাজ ও দেশের আনুগত্য না করে একমাত্র নেতার আনুগত্যের মধ্যেই মুক্তি, এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্মোহনের মাধ্যমে মন-মস্তিষ্ক সমাজ-সংসারের চেতনাশূন্য করে 'আল্লাহর আইন চালু'র মায়াজালে বন্দী করা হয়েছে। ফলে এসব লোকের পরিবারের অন্য সদস্যগণও এসব লোকদের প্রতি প্রায় মায়া-মমতা শূন্য হয়ে পড়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে গোয়েন্দা সূত্রে পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্মঘাতী এসব লোকের মরদেহ তাদের পরিবারের কেউ-ই গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ ও এদের সম্পর্কে কিছু শুনতেও তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে।

এভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংসার, সমাজ ও দেশের প্রতি বিরাগ ভাজন করে এসব লোকদের মাধ্যম্যে নিকটতম ও দূরতম ঐসব প্রতিবেশী দেশই শান্তির দেশ–

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অস্থির করে তুলে দুনিয়ার সম্মুখে 'অকার্যকর ও ব্যর্থরাষ্ট্র' হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করে আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল ভূমি, এখানে মুসলমানদের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ শান্তির সাথে বসবাস ও নির্বিঘ্নে আনন্দ চিত্তে শঙ্কামুক্ত মনে ধর্ম পালন করছে। মুসলমানদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র মাস– রমজান মাসেও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশে পূজা-পার্বন অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে মসজিদ-মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করছে এবং উভয়স্থানে একই সময়ে যার যার ধর্ম সে সে পালন করছে। একই অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে চাকরী করছে, পরস্পরের বাড়িতে দাওয়াত খাচ্ছে, একে অপরের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হবার পরও মুমূর্ষ রোগীকে নিজের দেহের রক্ত দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের উন্নতি, অগ্রগতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উদার গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাদের কাছে অসহ্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে যারা বিরোধিতা করেছে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষেই এদেশের কলকারখানার যন্ত্রপাতি লুট করেছে, যারা ১৯৪৭ সালের ভৌগলিক সীমারেখা মানতে নারাজ এবং বাংলাদেশী নয়– বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মঙ্গল প্রদীপ ও রাখিবন্ধন সংস্কৃতির অনুসারী, বাংলাদেশের প্রতি যারা বন্ধুত্বের প্রশ্নে উত্তীর্ণ নয় এবং সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত হবার কারণে যারা দুনিয়াব্যাপী বদনাম অর্জন করেছে, তারাই তাদের গোয়েন্দা সংস্থা ও এদেশীয় তল্পীবাহকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে আত্মঘাতী লোকদের দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এ দেশকে 'অকার্যকর ও ব্যর্থরাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নত করার অপচেষ্টা করছে কিনা, এ প্রশ্ন সচেতন মহলের মনে সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহর আইন– বৃটিশ ও পাকিস্তান যুগ

বৃটিশরা এদেশকে প্রায় দুইশত বছরব্যাপী শাসন করেছে। এরপর ২৪ বছর বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে পরিচিত ছিলো। তখন তো কেউ-ই 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে এদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদী কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্থান করে নিলো, একের পর এক সরকার পরিবর্তন হলো, দীর্ঘ এ সময়েও কেউ উক্ত দাবি তুলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেনি।

১৯৯৬ সালের পরে এদেশের শাসন ক্ষমতায় যারা এলেন, তাদের শাসনামলে ১৯৯৯ সালের ৬ই মার্চ যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালিয়ে ১০ জনকে হত্যা করা হলো, একই সালের ৮ই অক্টোবর খুলনায় কাদিয়ানীদের

উপাসনালয়ে বোমা নিক্ষেপ করে ৮ জনকে হত্যা করা হলো এবং ফরিদপুর জেলার এক মাজারে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো ৪ জনকে, ২০০১ সালের ২০শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন মাঠে কমিউনিষ্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলা করে হত্যা করা হলো ৭ জনকে এবং একই সময়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হলো, ২০০১ সালের ১৪ই এপ্রিল- পহেলা বৈশাখে ঢাকার রমনা বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে ১০ জনকে হত্যা করা হলো, ২০০১ সালের জুন মাসের ৩ তারিখে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরের একটি গীর্জায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১০ জনকে হত্যা করা হলো, একই সালের ১৫ই জুন নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো ২২ জনকে, ২৩সে সেপ্টেম্বর বাগেরহাটের মোল্লার হাটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হলো ৮ জনকে, ২৬শে সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো ৪ জনকে।

অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বোমা নিক্ষেপ করে অনেক মানুষ হত্যা করা হলো, চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হলো কয়েক শত মানুষকে এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করা হলো। এসব বোমাবাজি যেখানে যেখানে ঘটলো, সেখানে কোথাও 'আল্লাহর আইন চালু'র দাবি তুলে বোমা নিক্ষেপ করেছে বলে শোনা যায়নি এবং 'আল্লাহর আইন চালু'র পক্ষে কোনো সংগঠনের লিফলেটও পাওয়া যায়নি। এ সময়ে বাংলাদেশের কোনো একটি আদালতের বিচারককেও হুমকি দিয়ে কেউ-ই কোনো চিঠি দিলো না, আদালতেও কেউ বোমা নিক্ষেপ করলো না এবং আত্মঘাতী কোনো লোকেরও সন্ধান পাওয়া গেলো না। বাংলাদেশকে 'অকার্যকর ও ব্যর্থরাষ্ট্র' হিসেবেও কোনো মহল থেকে চিহ্নিত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হলো না। বিচারকের মাথায় লাঠি মারার হুমকি দেয়ার পরও কেউ-ই আদালতে সুয়েমোটো মামলা করলো না।

২০০১ সালের পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী চারদলীয় জোট বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসীন হলো। ইতোপূর্বে যেখানে কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে ইসলামপন্থীদের অমর্যাদা করা হয়েছে, খুনের অভিযোগে শায়খুল হাদীসের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ আলেমকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হয়েছে, মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে, অগণিত আলেম-ওলামাকে গ্রেফতার করে জেলখানা পরিপূর্ণ করা হয়েছে, সেখানে পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পরে আলেম-ওলামাগণ সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন, প্রচার মাধ্যমে তাঁরা বক্তব্য রাখার ও সরকারী অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও এমপিগণ আলেমদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকার গুরুত্ব দিয়েছে ও সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে সর্বাত্মক অভিযান শুরু

করেছে, বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যখন দেশের বাস্তব অবস্থা, ঠিক তখনই এই সরকারের শেষ বছরে হঠাৎ করে নানা ধরনের ভুঁইফোড় সংগঠনের নাম দিয়ে 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে আত্মঘাতী বোমাবাজদের মাধ্যমে দেশে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

ইসলামের নাম শুনলেই যাদের গাত্রদাহ শুরু হয় এবং আলেম দেখলেই যাদের নাকে কয়েকটি ভাঁজ দেখা দেয়, কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে যারা ইসলামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, মাদ্রাসাকে যারা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসীদের আখড়া বলে চিহ্নিত করে, সংবিধানের শুরু থেকে যারা বিস্‌মিল্লাহ্ মুছে দেয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম থেকে যারা কোরআনের আয়াত মুছে দেয়, নাস্তিক-মুরতাদদের যারা পরম হিতৈষী-বন্ধু এবং আলেমদেরকে শত্রু মনে করে, চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় যাবার প্রধান বাধা মনে করে যারা জোট ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে প্রকাশ্যে দাবি তোলে, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ার লক্ষ্যে যারা আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়, 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে আত্মঘাতী বোমাবাজ তাদেরই তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি ও পরিচালিত হচ্ছে কিনা, এ প্রশ্ন বর্তমানে সচেতন মহলের মনে সৃষ্টি হয়েছে।

মূলধারার ইসলামী দল বনাম সন্ত্রাসবাদ

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্থান করে নেয়ার পরপরই এদেশে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী দলগুলো পরিবর্তিত পরিবেশে আন্দোলনের সূচনা করেছে এবং এখন পর্যন্তও তারা আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ইসলামী দলগুলো পাকিস্তান শাসনামলেও প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে এবং জাতীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করেছে। বাংলাদেশেও দেশ ও জাতির সঙ্কটকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এসব দল গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করেছে। সূচনালগ্ন থেকেই মূলধারার ইসলামী দল সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করে আসছে। কখনো এ দল অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা, ষড়যন্ত্র বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। এ দলের অনেক নেতা-কর্মীকে অন্যান্য দলের লোকজন অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেছে, চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছে অনেককে। কিন্তু মূলধারার ইসলামী দল কখনো প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অন্য দলের নেতা-কর্মীর কোনো ক্ষতি করেছে বলেও কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না।

ইসলামী আন্দোলন এ দেশে অসংখ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছে এবং এসব সাহিত্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সাহিত্যে এমন একটি শব্দও নেই, যা

মানুষকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এমন একটি লাইনও ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্যে অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। বরং দলের নেতা-কর্মীগণ সমাজ ও দেশে শান্তির পক্ষে সবসময়ই সোচ্চার রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের সেবায় নিজদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। এ লক্ষ্যে তারা দেশব্যাপী নানা ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবা করে আসছে।

বর্তমানে যাদেরকে আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, মূলধারার ইসলামী দলগুলোর সাথে এদের দূরতম সম্পর্ক নেই। ইসলামী আন্দোলন যারা করে তারা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তকে মহান আল্লাহর নে'মাত বলেই মনে করে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করে। কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় পেলেই এরা কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যসহ অন্যান্য সাহিত্য অধ্যয়ন করে। দেশ-বিদেশের সংবাদ জানার চেষ্টা করে এবং নিয়মিত পত্রিকা পাঠ করে। যেসব লোককে ইসলামের নামে বোমা হামলার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, পত্র-পত্রিকার সংবাদ অনুসারে এদেরকে কোনো ধরনের সংবাদ শুনতে দেয়া হয়না, পত্রিকা পড়তে দেয়া হয় না এবং নিজেদের সৃষ্ট বলয়ের বাইরে এদেরকে আসতেও দেয়া হয়না। এসব লোকের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইসলাম ও মূলধারার ইসলামী দলকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চলছে। আর এ কাজে ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শে বিশ্বাসী রাম-বামপন্থীদেরকেই সবথেকে বেশী তৎপর দেখা যাচ্ছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম

সন্ত্রাসী তৎপরতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, তাহলো বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গীবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বিশেষ কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা, দলের প্রাধান্য বিস্তার, নির্বাচনে আসন দখল, ক্ষমতা দখল ইত্যাদি কারণে অনেকেই সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতা পরিচালিত করেছে, এ ইতিহাস সচেতন মহলের সম্মুখে রয়েছে। ইয়াহূদীরা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারা দুনিয়াব্যাপী নানা ধরনের তৎপরতা সুদূর অতিত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চালিয়ে আসছে। মাওবাদ ও লেলিনবাদের অনুসারীরা নানা পদ্ধতিতে সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতা পৃথিবীর দেশে দেশে পরিচালিত করছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সময় একশ্রেণীর মুশরিকরা সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতা চালিয়েছে, তারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনসহ বোমাবাজী করে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে।

কোনো কোনো বাম রাজনৈতিক আদর্শের নেতৃবৃন্দ 'ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে আসে' এ শ্লোগান তুলে সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতাকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতা এই আন্দোলনের ইতিহাসে অনুপস্থিত। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও কেউ ইসলামী তৎপরতার মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গী মনোভাবের সামান্যতম গন্ধও খুঁজে পাবে না। কারণ এই আদর্শ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করেছেন, পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও অন্যান্য অশান্তি দূরিভূত করার লক্ষ্যেই এই আদর্শের আগমন। প্রত্যেক নবী-রাসূলও পরিচালিত হয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের প্রশ্ন ওঠাই অবান্তর।

ইসলামী আদর্শ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এই আদর্শের অনুপম গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণে। চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর ও কল্যাণধর্মী সৌন্দর্যের কারণেই মানুষ ইসলামী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে হবে, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে দূরে থাক– কোনো একজন নবী-রাসূলকেও পদ্ধতি নির্ণয়ের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। এ পদ্ধতি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে শিখিয়েছেন। ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা শিখাচ্ছেন–

أُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ–

(হে নবী) তুমি তোমার মালিকের পথে মানুষদের প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, কখনো তর্কে যেতে হলে তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা। (সূরা নাহল-১২৫)

ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে জুলুম-অত্যাচার এলে প্রতিবাদে কারো প্রতি জুলুম-অত্যাচারও করা যাবে না, মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয়– ভালো দিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ–

(হে নবী,) তুমি নির্যাতন নিপীড়নে ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য সম্ভব হবে শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য দিয়েই, এদের আচরণের ওপর দুঃখ করো না, এরা যেসব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুন্ন হয়ো না। (সূরা নহল-১২৭)

ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন যত কথা বলেছে, তা এখানে উল্লেখ করতে গেলে এ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। মহান

আল্লাহ্ তা'য়ালা যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন, এর মধ্যে কোথাও কি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের গন্ধ পাওয়া যাবে? ইসলাম সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও পৈশাচিক নীতিকে ঘৃণা করে এবং এসব কিছুর বিরুদ্ধেই ইসলাম জিহাদ ঘোষণা করেছে। পৃথিবী থেকে এসব অনাচার উৎখাত করার জন্য মানুষের প্রতি বারবার আহ্বান জানিয়েছে ইসলাম।

আল্লাহর আইন চালু করার ধুয়া তুলে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের শিখানো পদ্ধতি পরিহার করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে দাঙ্গা, অশান্তি, জনমনে ভীতি, আতঙ্ক ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, তাদের সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে–

اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِى الاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَرْضِ-ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

যারা আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের জন্যে, তাছাড়া পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই। (সূরা মায়িদা-৩৩)

জনমনে আতঙ্ক বা ভীতি সৃষ্টি হতে পারে, ইসলাম এ ধরনের কোনো কর্ম বা আচরণ করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো হাতে উলঙ্গ (খাপমুক্ত) তরবারী বের করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরেক হাদীসে তিনি কারো প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে কথা বলতেও নিষেধ করেছেন। এমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হারাম করা হয়েছে, যে পরিবেশ নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী পরিণতিবরণ করবে। তিনি বলেছেন–

لاَيُشِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلٰى اَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ-فَاِنَّهُ لاَيَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهٖ ضَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ-

তোমাদের কেউ যেনো তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের মাধ্যমে ইশারা না করে, কারণ শয়তান কখন তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিবে এবং সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তা সে অনুভবও করতে পারবে না। (বোখারী-মুসলিম)

مَنْ اَشَارَ اِلٰى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتّٰى يَنْتَهِىْ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّهِ-

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি কোনো অস্ত্রের মাধ্যমে ইশারা করে তখন ফেরেশ্‌তারা তার ওপর অভিশাপ করে, যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয়। যদিও তার আপন ভাই-ই হোক না কেনো। (মুসলিম)

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُّرَدِّعَ مُسْلِمًا-

কোনো মুসলমানের জন্যে জায়েয নয় আরেকজন মুসলমানকে ভয় দেখানো।

এটাই ইসলাম। উন্মুক্ত তরবারী বা অন্য কোনো অস্ত্র দেখলে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে, ইসলাম এটাও বরদাস্ত করে না। জনমানসে শান্তির জোয়ার প্রবাহিত করার জন্যই ইসলামের আগমন। যারা জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করবে, সূরা মায়িদার উক্ত আয়াতে তাদের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছে। ফিত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইসলাম কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। ফিত্‌না সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারায় বলেছেন- وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ- ফিতনা-ফাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা নরহত্যার চাইতেও বড় অপরাধ। (সূরা বাকারা-১৯১)

সুতরাং ইসলামে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের গন্ধ থাকা দূরে থাক, ইসলামের সাথে এসবের দূরতম সম্পর্কও নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ইতিহাসের সবথেকে বর্বর নির্যাতন সহ্য করেছেন। যখন তাঁরা নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁরা কি সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে ইসলামের দুশমনদের হত্যা করতে পারতেন না? জঙ্গী তৎপরতা প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারতেন না? বরং তাঁরা অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে মৃত্যুকেই বরন করেছেন, তবুও অনিয়মতান্ত্রিক পথ, সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করেননি বা কোনো ধরনের বক্র চিন্তাও করেননি।

মদীনায় হিজরত করার পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানরা তখন বিপুল শক্তির অধিকারী। মক্কা থেকে শত্রুপক্ষের লোকজন মাঝে মধ্যে চুপিসারে এসে মদীনার ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করতো এবং বৃক্ষ ধ্বংস করে দিতো। প্রতিশোধ হিসেবে মুসলমানরাও গোপনে মক্কায় গিয়ে ফসল আর বৃক্ষ ধ্বংস করে দিতে পারতো। মদীনার পাশ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া ব্যতীত মক্কার কাফিরদের দ্বিতীয় কোনো পথ ছিলো না। অত্যাচারিত মুসলমানরা এসব শত্রুপক্ষ ব্যবসায়ীদের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারতেন। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে উল্লেখ করা

হয়েছিলো, মক্কা থেকে কোনো মুসলমান মদীনায় এলে তাকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাতে হবে, আর মদীনা থেকে কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি-শর্তের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গুপ্তচর হিসেবে মদীনার মুসলমানদেরকে মক্কায় পাঠিয়ে শত্রুদের ক্ষতি করতে পারতেন না? কিন্তু তিনি এসবের চিন্তাও করেননি। ইসলাম সাম্য-মৈত্রীর আদর্শ, সেই ইসলাম কোনোভাবেই সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদ বরদাস্ত করবে না।

মক্কা বিজয়ের পরে ঐ লোকগুলো আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের কাছে করুণার পাত্রে পরিণত হলো, যারা লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করেছে, বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। অবশেষে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। সেই লোকগুলো যখন মুসলমানদের সম্মুখে এসেছে, মুসলমানরা ইচ্ছে করলে কি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন না? প্রতিশোধ গ্রহণ করা দূরে থাক– নবীয়ে রহমত সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। সেই ইসলাম কি আল্লাহর আইন চালুর নামে মানুষ হত্যা, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ বা বোমাবাজি সমর্থন করতে পারে?

মানুষ সামান্যতম অসুবিধা ভোগ করুক, এটাও ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ ইসলামের কাছে মানুষের সম্মান-মর্যাদা অনেক উচ্চে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً–

আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র (জিনিসসমূহ দিয়ে) আমি রিযক দান করেছি, অতপর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭০)

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের সম্মান-মর্যাদা অনেক বেশী এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর কাছের ফেরেশ্তাদের তুলনায়ও অনেক বেশী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম সাথে নিয়ে মদীনায় এক স্থানে বসে রয়েছেন, তখন তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন। তিনি দেখতে পেলেন, একটি লাশ দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লাশ তাঁর সম্মুখ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁকে দাঁড়াতে দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও দাঁড়ালেন। একজন সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ লাশ তো একজন ইয়াহূদীর! নবীয়ে রহমত বললেন, কেনো, ইয়াহূদী কি মানুষ নয়!

এই মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা অন্য সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, পৃথিবীতে চলাচলের বাহন দিয়েছেন এবং তাদের জীবন-ধারণের উপকরণ দান করেছেন।

আল্লাহর রাসূল মানুষের প্রতি অসীম সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আর সেই মানুষকেই আল্লাহর আইন চালুর নামে বোমাবাজি, সন্ত্রাস আর জঙ্গী তৎপরতা চালিয়ে হত্যা করা কি ইসলাম সমর্থন করতে পারে?

বিবাহিত মানুষ জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ইসলাম তার শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। আর অবিবাহিত মানুষ এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হলে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছে। কারণ একজন অবিবাহিত মানুষ যৌবনের উদগ্র কামনা তাড়িত হয়ে এ কাজ করতে পারে। মানব প্রকৃতির চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখেই ইসলাম বিভিন্ন অপরাধের দন্ড নির্ধারিত করেছে। মানব প্রকৃতি ও চাহিদার এতটা গভীরে যে ইসলাম দৃষ্টি দিয়ে দন্ডবিধি হ্রাস করেছে, সেই ইসলাম কি সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের সমর্থক হতে পারে?

শক্তি প্রয়োগে আদর্শ প্রতিষ্ঠা

ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্র বা দলীয় শক্তি প্রয়োগ করে কোনো কোনো আদর্শ দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শাস্তির ভয়ে প্রকাশ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষ সে আদর্শের অনুসরণ করেছে আর আড়ালে প্রকাশ করেছে অন্তরের ঘৃণা। অনেক রাজা-বাদশাহই এ ধরনের হঠকারিতামূলক কাজ করেছেন। তারা যে বোধ-বিশ্বাস অন্তরে লালন করতেন, তাই জোরপূর্বক জাতির ওপর আইন প্রয়োগ করে চাপিয়ে দিতেন। বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নেও আমরা দেখতে পেয়েছি, ইয়াহূদী সন্তান কার্লমার্কস সৃষ্ট সমাজতন্ত্র নামক আদর্শও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার নির্মম-নিষ্ঠুর কার্যক্রম।

কিন্তু যারা এই অবাস্তব পদ্ধতি প্রয়োগ করে আদর্শ টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তারা এ কথা ভুলে গিয়েছে যে, বিশ্বাস হলো মানুষের মনের সাথে সম্পৃক্ত। শক্তি প্রয়োগে কোনো বিশ্বাসের প্রতি মানুষের মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করা যায় বা কিছু সময়ের জন্য পালন করানোও যায় কিন্তু হৃদয়-মনে তা প্রতিষ্ঠিত করা যায়না। মানুষ তো পরম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে সেই আদর্শই অনুসরণ করে, যারা তা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। যে আদর্শের শিকড় হৃদয়-গভীরে প্রোথিত, তাই মানুষের বাহ্যিক অবয়বে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।

সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর, হালাকু খান, চেঙ্গিশ খান শক্তি প্রয়োগ করে কত নিয়ম-নীতি চালু করেছিলেন, এসবের কোনো অস্তিত্বও নেই। নিকট অতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা তো দূরে থাক, তাদের বিশাল বিশাল মূর্তিগুলোর গলায় শিকল লাগিয়ে টেনে নামানো হয়েছে। শক্তি প্রয়োগ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে আদর্শ অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং এর স্থায়িত্ব নেই- ক্ষণস্থায়ী। সামান্য কিছু কালের ব্যবধানে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই হলো ব্যতিক্রম সেই আদর্শ, যা লোভ-লালসা দেখিয়ে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করে অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচার-প্রসার করা হয়নি। ইসলামী আদর্শের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুপম গুণ-বৈশিষ্ট্য, নবী-রাসূলদের আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণ এবং সাহাবায়ে কেরামের আচরিত তুলনাহীন গুণাবলীর প্রতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম কবুল করেছে। আর এভাবেই ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে। সুতরাং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করে জঙ্গী পন্থায় যারা আল্লাহর আইন চালু করার চিন্তা করে, তাদের বোঝা উচিত এ পথ ইসলামের নয় এবং এই পথ অবলম্বন করে মানুষের মনে আল্লাহর আইনের প্রতি সম্মানবোধ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সৃষ্টি করা যাবে না।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ঢাল চুরির ঘটনা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। তাঁর ঢাল চুরি করলো একজন ইয়াহূদী। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের পদে আসীন। রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে ইয়াহূদীকে চরম শাস্তি দিয়েই তো ঢালটি উদ্ধার করতে পারতেন কিন্তু ইসলামী শিক্ষা তাঁকে সে পথে অগ্রসর হতে না দিয়ে আদালতে বিচারকের কাছে পাঠিয়েছে। আদালত সাক্ষী গ্রহণযোগ্য না হবার কারণে ইয়াহূদীর পক্ষে আর ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হযরত আলীর বিপক্ষে রায় দিয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান আদালতের রায় মেনে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছেন। পথিমধ্যে সেই ইয়াহূদী ছুটে এসে হযরত আলীকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে, যাদের আদর্শ এত সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করেছে, আমি সেই আদর্শ গ্রহণ করে মুসলমান হলাম। এই নিন আপনার ঢাল, এটি আমিই চুরি করেছিলাম।

ইসলাম এভাবেই প্রসারিত হয়েছে, শক্তি প্রয়োগে নয়। যে ভারত থেকে উচ্চারিত হয়েছে, 'ইসলাম তরবারীর জোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, ইসলামের ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে।' সেই ভারতেরই একটি ঘটনার উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে ইতি টানছি। ইংরেজ শাসনামলের সূচনালগ্নের একটি ঘটনা। ভারতের মুজাফ্ফর নগর জেলার কান্দেহ্লা নামক কস্বার একটি এলাকার এক স্থান নিয়ে মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টির উপক্রম হলো। মুসলিমদের দাবি এটি তাদের মসজিদের স্থান। আর হিন্দুদের দাবি এটি তাদের মন্দিরের স্থান। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ালে ইংরেজ বিচারক উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে মুসলিম নেতৃবৃন্দকে একান্তে ডেকে জানতে চাইলেন, আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদের এলাকায় এমন কোনো হিন্দু ব্যক্তি কি রয়েছেন, যার সত্যবাদিতার প্রতি আপনাদের আস্থা রয়েছে এবং যার সাক্ষী আপনারা গ্রহণ করবেন?

মুসলমান নেতৃবৃন্দ জানালো, এ ধরনের কোনো হিন্দু তাদের এলাকায় নেই। এবার ইংরেজ বিচারক হিন্দু নেতৃবৃন্দকে তাঁর খাসকামরায় ডেকে প্রশ্ন করলেন, আপনাদের

দৃষ্টিতে আপনাদের এলাকায় এমন কোনো মুসলিম ব্যক্তি কি রয়েছেন, যার সত্যবাদিতার প্রতি আপনাদের আস্থা রয়েছে এবং যার সাক্ষী আপনারা গ্রহণ করবেন?

হিন্দু নেতৃবৃন্দ জানালেন, আছে। শাহ্ আব্দুল আযীয দেহলভীর ছাত্র সাইয়্যেদ আহমদের খলীফা মুফতী ইলাহী বখ্শ সাহেবের বংশের লোকজন আমাদের এলাকায় বাস করে। তাঁরা সকলেই ধর্মভীরু এবং কখনো তাঁরা মিথ্যা কথা বলেন না এবং অবৈধ কোনো কাজও করেন না। সেই বংশের মুরুব্বির সাক্ষ্য আমরা হিন্দুরা মেনে নেবো।

সরকারীভাবে লোক পাঠিয়ে সেই বংশের মুরুব্বিকে আদালতে আনা হলে বিচারক সম্মানের সাথে তাঁকে বসতে দিলেন। হিন্দু-মুসলমান সকলের দৃষ্টিই ঐ আল্লাহভীরু লোকটির প্রতি নিবদ্ধ। কারণ তাঁর সাক্ষ্যের ওপরই মামলার রায় ঘোষণা করা হবে। বিচারক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ঐ স্থানটি সম্পর্কে হিন্দুরা দাবি করছে সেটা তাদের মন্দিরের স্থান, আর মুসলিমরা দাবি করছে সেটা তাদের মসজিদের স্থান। এ সম্পর্কে আপনি যা জানেন তা আদালতের সম্মুখে বলুন।

আল্লাহভীরু মুসলমান স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, উক্ত স্থান হিন্দুদের মন্দিরের।

মামলায় মুসলিমরা পরাজিত হলো আর হিন্দুরা বিজয়ী হলো। কিন্তু মুসলমানরা হেরে গেলেও ইসলামের নৈতিক বিজয় হলো। মুসলিম ব্যক্তির সত্যবাদিতা দেখে প্রায় শতাধিক হিন্দু ব্যক্তির মন-মস্তিষ্কে বিপ্লব ঘটে গেলো। তারাও ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেলেন। ইসলাম এভাবেই মানুষের মন জয় করেছে এবং এই পদ্ধতিতেই প্রচার-প্রসার লাভ করেছে।

নিয়মতান্ত্রিক পন্থা- আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার পথ

আল্লাহর আইন কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে চালু করতে হবে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিভাবে করতে হবে, এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার অধিকার সাধারণ কোনো মানুষের ওপর অর্পণ করা হয়নি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিভাবে করতে হবে, তা বাস্তবে দেখিয়েছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা করলেন, তখন মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার শর্তে আল্লাহর রাসূলের হাতে মক্কার সামগ্রিক ক্ষমতা তুলে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো। তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আল্লাহর নবী সামগ্রিক ক্ষমতা হাতে নিয়ে আল্লাহর আইন চালু করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

কারণ, আল্লাহর আইন যাদের মাধ্যমে চালু করা হবে এবং সে আইন যারা বাস্তবে প্রয়োগ করবে, সেই লোকগুলো তখন পর্যন্ত তৈরী হয়নি। আল্লাহর আইন চালু করার

পূর্বেই সেই আইনের ভিত্তিতে একদল মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং বাস্তব জীবনে সে মানুষগুলো আল্লাহর আইন অনুসরণ করবে। আল্লাহর আইনের প্রতি এসব লোকের অন্তরে বিদ্যমান থাকবে সর্বোচ্চ সম্মানবোধ এবং এই আইনের প্রতি অন্তরে থাকবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এ ভালোবাসাকে স্থান দিতে হবে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। এই আইন পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার প্রস্তুতি থাকতে হবে। এই ত্যাগ স্বীকারও সে বাধ্য হয়ে করবে না, আল্লাহর আইনের প্রতি গভীর মমতার কারণেই আন্তরিকভাবে ত্যাগ করবে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে এই ধরনের লোক সর্বপ্রথম তৈরী করতে হবে।

এই ধরনের লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়নি। তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সমাজের যেসব লোকজন লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করে রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বিধানের জীবন্তরূপে পরিণত হয়েছিলেন। মক্কায় ১৩ বছর আন্দোলন করে আল্লাহর নবী ৩১৩ জন সেই ধরনের মানুষ প্রস্তুত করলেন। কিন্তু আল্লাহর আইন চালু করার মতো জনসমর্থন মক্কায় পাওয়া গেলো না। সুতরাং সেখানে আল্লাহর আইন চালু করা গেলো না।

আল্লাহর রাসূল মক্কায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেই ৩১৩ জন প্রাণ উৎসর্গকারী লোকদের মাধ্যমে সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদী পন্থায় জনমনে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেননি। এসব লোকদের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আইনের বিপক্ষে অবস্থানকারী মক্কার লোকদের হত্যাও করাননি।

আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য পূর্ব থেকেই মদীনায় দাওয়াতী কাজ চলছিলো এবং সেখানে জনমত তৈরী হলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রমশ তৈরী লোকগুলো মদীনায় পাঠিয়ে সেখানের লোকদের মন-মানসিকতা বুঝে তাদের সাথে নিজেদের একাকার করে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। মদীনায় জনমত তৈরী হয়েছে, তবুও তিনি মক্কায় তৈরী করা সকল লোকগুলো নিয়ে তিনি একই সাথে একই দিনে মদীনায় হিজরত করেই সেখানে আল্লাহর আইন চালু করেননি।

দীর্ঘ পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিনি তৈরী করা লোকগুলোকে আস্তে আস্তে সেখানে পাঠিয়েছেন। যেনো মক্কার এসব লোকগুলো মদীনার লোকদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মন জয় করতে পারে এবং সেখানের পরিবেশের সাথে নিজেদের একাকার করে দিতে পারে। কারণ আল্লাহর আইন চালু করতে হবে মক্কায় তৈরী এসব লোকদের মাধ্যমেই, মদীনার প্রশিক্ষণহীন সদ্য মুসলমানদের মাধ্যমে নয়। আবার মদীনার লোকগুলো মক্কার লোকদের নেতৃত্ব মেনে নিবে কিনা, সে প্রশ্নও সম্মুখে ছিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পন্থায় মক্কায় তৈরী করা লোকগুলোকে ধীরে ধীরে মদীনায় প্রেরণ করে সবশেষে স্বয়ং তিনি প্রধান সহচর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুকে সাথে নিয়ে মদীনায় গমন করলেন। মদীনায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েই তিনি আল্লাহর দেয়া সকল আইন একযোগে চালু করেননি। তিনি ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর আইন চালু করতে থাকলেন। একটি করে আইন চালু করেছেন, সে আইনের প্রতি মানুষের মনে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করেছেন, আইন মানার মানসিকতা প্রস্তুত করেছেন, তারপর আরেকটি আইন চালু করেছেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তিনি মহান আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ আইন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া নেই, আন্দোলন-সংগ্রাম নেই, দাওয়াতী কাজ নেই, হঠাৎ করে আদালতে উপস্থিত হয়ে বোমা মেরে বিচারক হত্যা করে বলা হচ্ছে, 'আল্লাহর আইন চালু করার জন্য বোমা মেরে সওয়াবের কাজ করেছি, বিচারককে হত্যা করতে গিয়ে যদি নিজে নিহত হই তাহলে শহীদ হয়ে জান্নাতে যাবো।' এটাই যদি জান্নাত লাভের ফর্মূলা হতো, তাহলে প্রত্যেক সাহাবা সে যুগের বিচারকদের হত্যা করেই জান্নাতে যাবার পথ সুগম করতেন। অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ, সম্পদ ও প্রাণের কোরবানী দিতেন না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে লোক তৈরী করতে থাকলেন, কয়েকজন লোক যখন তৈরী হলো, সেই লোকদের তিনি মদীনায় প্রেরণ করে জনমত গঠনের কাজে নিয়োজিত করলেন। জনমত গঠনের এই প্রক্রিয়াকে বর্তমানে আমরা আধুনিক গণতন্ত্রের ভাষায় 'ভোট গ্রহণ পদ্ধতি' বলতে পারি। মদীনায় ভোট গ্রহণ করা হলো এবং জনরায় এলো আল্লাহর আইনের পক্ষে। মদীনার সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ আল্লাহর আইনের পক্ষে ভোট প্রদান করলেন। এরপর সেখানে আল্লাহর আইন জারী হলো।

আল্লাহর আইন চালু করার লক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করেছেন এবং যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেটাই অভ্রান্ত পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রথমে ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে একদল লোক তৈরী করতে হবে। দ্বিতীয়ত আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। এই দুটো পন্থা ব্যতীত আল্লাহর আইন চালু করার বিকল্প পথের শিক্ষা কেউ যদি দেয়, তাহলে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে হবে, এসব লোক আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের কঠিন দুশমন। এরা আল্লাহর আইন চালুর নামে ইসলামকে হেয়-প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়ার পথ সৃষ্টি করছে।

আল্লাহর আইন চালু করার মন্ত্রে দিক্ষিত করে বোমা হামলার কাজে যেসব অপরিপক্ক অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কিশোর-তরুণ ও কর্মহীন বেকার যুবকদের অর্থের বিনিময়ে

ব্যবহার করা হচ্ছে, তারা বুঝতে পারছে না, ইসলাম, মুসলিম মিল্লাত, দেশ ও জাতির কত বড় সর্বনাশের কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা করছে। এসব বিষয় বুঝার মতো শিক্ষা এরা পায়নি এবং সে ধরনের মন-মানসিকতাও এদের সৃষ্টি হয়নি। শত্রুপক্ষ এসব স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্থবির চিন্তার অধিকারী লোকদেরই বোমা হামলার কাজে ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছে।

আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি

আমরা ইতোপূর্বেই পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি থেকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিভাবে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে আল্লাহর আইন তথা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতি ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথ ও পদ্ধতি যারা অবলম্বন করবে, সে পদ্ধতি ভ্রান্ত এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির পথ। আল্লাহ্ তা'য়ালা দেশ ও সমাজের সাথে নিরাপত্তাবোধ যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বোমাবাজি তথা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয়টিকে ইসলাম, মুসলিম, দেশ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চলছে। এই কাজ যারা করছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ ۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ–وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ–اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহ্ তা'য়ালা যেসব সম্পর্কের ভিত মযবুত করতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে, সর্বোপরি যমীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এরাই হচ্ছে আসল ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাকারা-২৭)

দেশ ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে জান্নাতে লাভের আশা করা চরম মূর্খতা বৈ আর কিছু নয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলছেন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। আল্লাহর আইন চালুর নামে যারা সন্ত্রাসী তৎপরতায় অন্য যেসব লোকদের ব্যবহার করছে, ব্যবহৃত লোকগুলো হঠাৎ করেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে না। দিনের পর দিন প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের মন-মস্তিষ্কে এ কথা দৃঢ়মূল করে দেয়া হয়েছে যে, 'এ পথ কল্যাণের পথ এবং আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য এই পথ অবলম্বন করেছি' এবং প্রশিক্ষণের সময় কোরআন-হাদীসে উল্লেখিত জিহাদ সম্পর্কিত কথাগুলোর ভুল ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়েই এবং আল্লাহকে সাক্ষী করেই মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, 'আমরা আল্লাহর আইন চালু করার স্বার্থেই এসব কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি।' এই শ্রেণীর লোকদের বক্তব্য শুনে বা এদের লেখা বই পড়ে, সন্ত্রাসের কাজে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত লোকগুলো ধারণা করছে যে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এটিই সঠিক পথ।' এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهٖ-وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ-

মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এই পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভালোলাগে এবং নিজের 'উদ্দেশ্য' সৎ হবার ব্যাপারে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু। (সূরা বাকারা-২০৪)

আল্লাহর আইন চালুর নাম করে জনমনে সন্ত্রাস আর আতঙ্ক সৃষ্টি করার অর্থ হলো প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী দল সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা। এসব সন্ত্রাসী কাজের মূল লক্ষ্যই হলো, মানুষকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিমুখ রাখা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী দলকে মানুষ যেনো ঘৃণা করে সেই ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা। অর্থাৎ মানুষ যেনো প্রকৃত সত্যের পথে অগ্রসর হতে না পারে এবং কুফুরীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। সুতরাং ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাস করছে, তারা অবশ্যই ইসলামের বিপরীত পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং অন্য মানুষকেও ভুল পথে পরিচালিত করছে। আল্লাহ তা'য়ালা এসব লোকদের পরিণতি সম্পর্কে বলেন–

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُوْنَ-

যারা নিজেরাই কুফুরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েছে তাদেরকে আমি আযাবের পর আযাব দেবো, এটা হচ্ছে তাদের সেই অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির শাস্তি, যা তারা দুনিয়ায় করে এসেছে। (সূরা নাহ্‌ল-৮৮)

জাতীয় জীবনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, এ ধরনের যে কোনো কাজ করা হারাম এবং এসব কাজ যারা করে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে 'বিপর্যয় সৃষ্টিকারী' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন–

وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا-وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

এরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পসন্দ করেন না। (সূরা মায়িদা-৬৪)

পবিত্র কোরআনে একাধিকবার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তথা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকেই সোচ্চার এবং প্রত্যেক নবী-রাসূলই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম সন্ত্রাস উৎখাত করার লক্ষ্যে তৎপরতা চালিয়েছেন এবং প্রত্যেক যুগেই হক্কানী আলেম-ওলামায়ে কেরামও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। বর্তমানেও দেশের প্রত্যেক নাগরিককে এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে, আল্লাহর

আইন চালুর নামে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি। আর প্রচার মাধ্যমই হতে পারে এ কাজে সবথেকে সহজ ব্যবহার যোগ্য হাতিয়ার।

বোমা হামলা- প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই সন্ত্রাসী মন-মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিক রয়েছে এবং তারা কোনো না কোনো কারণে সুযোগ পেলেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে থাকে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় এবং এসব সন্ত্রাসীদের শাস্তি দেয়ার দন্ডবিধিও অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু বাংলাদেশে 'আল্লাহর আইন চালুর' নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার বিষয়টি বর্তমানে যেভাবে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, ইতোপূর্বে এ ধরনের শ্লোগানও শোনা যায়নি এবং আল্লাহর আইন চালুর নাম করে কেউ সন্ত্রাসও করেনি। ইসলামের কথা বলে যেসব সংগঠন সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে, যেমন হরকাতুল জিহাদ, জুমরাতুল মাসাকীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা জেএমবি, আল্লাহর দল ইত্যাদি। এসব ভুঁইফোড় সংগঠনের নামও ইতোপূর্বে শোনা যায়নি।

উল্লেখিত সংগঠনসমূহের মূল নেতৃত্বে কে আছেন এবং তাদের উপদেষ্টা ও কর্মপরিষদে কারা আছেন, তাদের ইসলামী জ্ঞান কতটুকু, শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, সামাজিক অবস্থান কার কোন্ ধরনের, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি কোন্ পর্যায়ের, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং দল পরিচালনায় অর্থের উৎসই বা কি, এসব ব্যাপারে জাতি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে।

তবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে যতদূর জানা যায় যে, দেশে ১৯৯০ সাল থেকে এ ধরনের বেশ কিছু সংগঠনের জন্ম হয়েছে। ব্যক্তি কেন্দ্রিক এসব সংগঠন একত্রিত হয়ে ১৯৯৮ সালে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিহাদে লিপ্ত হবার জন্য একই প্লাটফর্মে কাজ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরা ক্রমাগত ১০ বছর একই সাথে কাজ করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। নিজেদের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারাদেশে সন্ত্রাসী রিক্রুটমেন্ট ও সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে। অপরিচিত এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অপরিপক্ক কিশোর, তরুণ ও বেকার যুবকদের অর্থের প্রলোভন দিয়ে আর ইসলামের কথা বলে বোমা বহন, বিস্ফোরণ ও বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়।

এমনভাবে লোকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার দল গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, বোমা হামলাসহ অন্যান্য অস্ত্র পরিচালনায় দক্ষ এবং এরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তেও সক্ষম। ইতোমধ্যে তারা তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার প্রমাণও দিয়েছে। ধর্মের নামে বোমা সন্ত্রাসে নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারে বর্তমানে যাদের নাম পত্র-পত্রিকায় বারবার লেখা হচ্ছে, সেই লোকগুলো

অতিতে পুলিশ, বিডিআর বা সামরিক বাহিনীতে কোনো সময় কর্মরত ছিলো বলে এ পর্যন্তও জানা যায়নি। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এসব লোকগুলো বোমা বানানো থেকে শুরু করে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বিধি শিখলো কোত্থেকে? সামরিক কায়দায় এদের প্রশিক্ষণ দিলো কে? এসব সরঞ্জামই বা তারা কোত্থেকে যোগাড় করছে এবং যোগানদাতা কে?

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, দেশের অভ্যন্তরে যখনই এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটছে, সাথে সাথে প্রতিবেশী একটি দেশের টিভি চ্যানেল, অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম, বাংলাদেশে অবস্থিত সে দেশের রাষ্ট্রদূত এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো কোনো ধরনের তদন্ত ব্যতীতই একযোগে কোরাস কণ্ঠে ঘোষণা করছে, 'এই সন্ত্রাসী কর্ম করা হয়েছে ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে এবং এর সাথে যারা জড়িত, তারা সকলেই ইসলামপন্থী।'

ইতোপূর্বে বাংলাদেশে যখন ধর্মনিরপেক্ষ একটি দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিছু সময়ের সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। নিজ দেশের সম্মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে সে সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ ও ধর্মীয় সন্ত্রাস সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মনে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করা হলো যে, তিনি তার সফরসূচী পরিবর্তন করে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হলেন। রাষ্ট্রীয় খরচে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় উগ্রবাদ ও জঙ্গীবাদের উত্থান সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেও তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আমেরিকার প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপহার দিয়ে অনুগ্রহ কুড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, ঐ ধর্মনিরপেক্ষ দল যখন ক্ষমতায় ছিলো, তখন থেকেই বাংলাদেশে ধর্মের নামে বোমাবাজির সূচনা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ দলের বলয়ভুক্ত বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, গবেষক, প্রবন্ধকার, চলচ্চিত্রকার লোকজন সম্মিলিতভাবে 'বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীবাদের উত্থান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশ, বাংলাদেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণু পরিবেশ' ইত্যাদি ধরনের প্রবন্ধ, বই ও ছবি নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কাছে পাঠিয়ে ছিলো।

এর বেশ কিছুদিন পরে 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' নামক একটি সংস্থার উদ্যেগে তিন দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো। আলোচনা সভার মূখ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হলো, 'ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা।'

দেশ-বিদেশের অনেক পন্ডিত যোগ দিয়েছিলেন, বাংলাদেশেরও এমন কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব উক্ত আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে দাওয়াত পেয়েছিলেন,

যারা নামায আদায় করেন। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আলোচনা সভায় আলোচকদের মধ্যে অনেকেই 'ধর্মীয় জঙ্গীবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সরাসরি ইসলামকে আঘাত করে বক্তব্য দিতে থাকেন। এমনকি জার্মানির এক অখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিচিত প্রফেসর উপাধি ব্যবহারকারী হ্যান্স কিপেনবার্গ নামক লোকটি 'সন্ত্রাসই ইবাদত এবং ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ' শীর্ষক একটি কুৎসিত-পদবাচ্য প্রবন্ধ উক্ত সেমিনারে পাঠ করে। এই লোকটি পবিত্র কোরআনের জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত উদ্ধৃত করে ও কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করেছিলো যে, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মুসলমানদের কাছে আল্লাহর ইবাদাত করার সমতুল্য এবং ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে যারা অগণিত মানুষ হত্যা করলো, তারা সকলেই মুসলমান এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনই তাদেরকে এই জঘন্য কাজে উৎসাহিত করেছে। শুধু তাই নয়, বদ্ধ উন্মাদ ঐ ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেছিলো এই বলে যে, 'মুসলমানদের ধর্মনেতা মুহাম্মাদ (সাঃ) এক যুদ্ধবাজ ছিলেন।'

অবশ্য তার বিদ্বেষ প্রসূত অসভ্য বক্তব্যের প্রতিবাদও দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে করেছিলেন আলোচনা সভায় উপস্থিত বিচারপতি মোস্তফা কামাল সাহেব। যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল ভূমি ও পরধর্ম-পরমত সহিষ্ণু হিসেবে সারা দুনিয়ায় পরিচিত, যে দেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির চিহ্ন নেই, সকল ধর্মের লোকজন পরস্পর আপন আত্মীয়ের ন্যায় বসবাস করে, একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় চলে, পাশাপাশি ব্যবসা ও অন্যান্য কর্ম করে, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ক্ষেত্রে, কোথাও চাকরীর ব্যাপারে জাতি-ধর্মের কোনো পার্থক্য নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, উক্ত সেমিনারের আয়োজন মুসলিম প্রধান এবং ধর্মভীরু হিসেবে পরিচিত সেই বাংলাদেশে কেনো করা হলো?

এর আয়োজন তো করা প্রয়োজন ছিলো ইউরোপ-আমেরিকার কোনো দেশে। যেখানে পাসপোর্টে বা পরিচয় পত্রে মুসলিম নাম দেখলেই তাদের চেহরায় এক অবিমিশ্র ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়। গায়ের রঙ কালো হবার কারণে যেখানে নিজ দেশের মানুষকেই হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র গায়ের রঙ কালো হবার কারণে যারা সরকারী চাকরী, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজ দেশে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেও মর্যাদা পায় না। বর্ণবাদের আগুনে যে ইউরোপ-আমেরিকা জ্বলছে, যেখানে মুসলিম নারীর হিজাব ব্যবহারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেখানেই তো উক্ত সেমিনারের আয়োজন করা উচিত ছিলো!

যে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে বাল্মিকি মুনির কল্পনার নায়ক রামের জন্মস্থানের অজুহাতে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানো হয়, অসংখ্য মসজিদকে যেখানে কয়লার গুদাম, হোটেল, পানশালা ইত্যাদিতে পরিণত করা হয়েছে, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কোর্টের মাধ্যমে আইন পাস করে যেখানে আযান বন্ধ করা হয়েছে, গরু যবেহ বন্ধ করা হয়েছে, শিক্ষালয়ের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে মুসলমানদের খারাপভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, প্রত্যেক দিন যেখানে ভিন্ন ধর্মের নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য ধ্বংস করে পথের কাঙালে পরিণত করা হচ্ছে, সেখানেই তো উক্ত সেমিনারের আয়োজন করা প্রয়োজন ছিলো!

এরপর আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, ২০০৪ সালের ২১শে অগাষ্ট ঢাকায় ভারত ঘেষা হিসেবে পরিচিত ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখে এক সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বোমা হামলার ঘটনায় ২২ জন মানুষ নিহত হলো, আহত হলো অনেকে। উক্ত বোমা হামলার ঘটনা যারা ঘটিয়েছিলো, তাদের অনেকে এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে। গ্রেফতারকৃত লোকগুলো সকলেই জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছে, তাদের প্রতি নিষেধ ছিলো, বোমা যেনো কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখানে নিক্ষেপ করা না হয়। ইতোপূর্বে ১৯৯৯ সালে ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী কর্তৃক যশোরে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা হলো তখনই যখন নেতৃবৃন্দ মঞ্চ থেকে নেমে গেলো। এ ঘটনায়ও ১০ জন নিহত হলো, আহত হলো অনেকে।

২০০১ সালের ২০শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে কমুনিষ্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করা হলো ৭ জনকে, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সামান্য আঘাতও পেলেন না। ২০০১ সালের ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকার রমনা বটমূলে নাস্তিক্যবাদী সংগঠন ছায়ানটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সরে যাবার সাথে সাথেই বোমা হামলা হলো, নিহত হলো ১০ জন। এ ঘটনা ঘটার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুনসহ রাস্তায় মিছিল করা হলো। প্রশ্ন জাগে, এতদ্রুত কিভাবে ব্যানার ও ফেস্টুন লেখা হলো?

২০০১ সালের ১৫ই জুন ঢাকা নারায়নগঞ্জে আওয়ামী লীগের জেলা কার্যালয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে বোমার বিস্ফোরণ ঘটলো, নিহত হলো ২২ জন। উপস্থিত ধর্মনিরপেক্ষ দলটির সংসদ সদস্য অক্ষত রইলেন। একই সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাটে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমা হামলা হলো, নিহত হলো ৮ জন, নেতৃবৃন্দ সামান্য আঘাতও পেলেন না। এই ঘটনার মাত্র তিনদিন পর ২৬শে সেপ্টেম্বর সিলেট-সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের সমাবেশে

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মঞ্চ থেকে নেমে যাবার সাথে সাথে বোমা হামলা হলো, নিহত হলো ৪ জন। সেই জেলাতেই ধর্মনিরপেক্ষ দলের একজন সংসদ সদস্যের বাড়িতে বোমা প্রস্তুতকালে বিস্ফোরণ ঘটে নিহত হলো ২ জন। ধর্মনিরপেক্ষ দলের একজন কেন্দ্রীয় নেতা সিলেট-হবিগঞ্জে বোমা হামলায় নিহত হয়েছে বটে, কিন্তু দলের কাছে তার গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিলো বলে রাজনীতি বিশ্লেষকগণ বলেছেন এবং বোমায় আহত হবার পরে তাকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য এমন প্রক্রিয়ায় ঢাকা আনা হয়েছিলো যে, পথেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে ঢাকায় আনার প্রক্রিয়াটি এখন পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে যখন এ ধরনের বোমা হামলার ঘটনা একের পর ঘটতে লাগলো, তখন হঠাৎ করেই প্রতিবেশী দেশ থেকে আওয়াজ উঠলো, 'বাংলাদেশ জঙ্গীবাদী অধ্যুষিত একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র।'

এই আওয়াজ উঠলো তখনই, যখন 'ফরেন পলিসি' নামক একটি সাময়িকী আমেরিকায় প্রকাশ হচ্ছিলো। উক্ত সাময়িকীতে 'ব্যর্থ রাষ্ট্রের সূচক' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। সেখানে ব্যর্থ রাষ্ট্রের ও অস্থিতিশীল রাষ্ট্রের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, এর মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মুসলিম দেশসহ বাংলাদেশের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর হিসাব অনুসারে বর্তমান পৃথিবীতে ব্যর্থ রাষ্ট্রের সংখ্যা ২০টি। সাময়িকীতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, জনসেবা দিতে পারেনা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, কালোবাজারি রোধ করতে পারেনা, নিরাপত্তা দিতে পারেনা এবং জনগণের বিক্ষোভ মোকাবেলা করতে পারে না, এগুলোই হলো ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র।

ব্যর্থ রাষ্ট্র সম্পর্কে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। জাতিসংঘের মহাসচিবও বলেছেন, 'ব্যর্থ রাষ্ট্রকে অস্বীকার করলে তা এক সময় আমাদের কামড়াতে আসবে।'

মূল বিষয় হলো, রাষ্ট্র হিসেবে কোনো দেশ ব্যর্থ হলে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বতন্ত্র অবয়বে ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বসহ পৃথকভাবে টিকে থাকতে পারেনা। সুতরাং বাংলাদেশকে যদি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করা যায়, তাহলে এ দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে টিকে থাকার অধিকার হারাবে এবং অন্য কোনো শক্তিশালী দেশের কলোনী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রশ্ন জাগে, এ দেশকে ব্যর্থ ও কার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্যই কি বোমা হামলাসহ অন্যান্য অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে?

সকল প্রশ্নের একটিই জবাব

ওপরে প্রশ্নাকারে আমরা যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছি এবং যে সকল প্রশ্ন উথাপন করেছি, এর জবাব পাবার জন্য আমাদেরকে একটু পেছনের ইতিহাসে যেতে হবে। ভদ্রলোক সামুয়েল পি হান্টিংটন নামেই পৃথিবীর সচেতন মহলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রফেসর। জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে উক্ত ভদ্রলোক আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে নিরাপত্তা পরিকল্পনার পরিচালক এবং আমেরিকান পলিটিক্যাল সাইন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই ভদ্রলোকই আমেরিকার 'ফরেন পলিসি' নামক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও কো-এডিটর এবং আমেরিকার রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করা হয়।

উক্ত ভদ্রলোকের লেখা The Clash of Civilization and the Remaking of World Order নামক বইটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং সারা দুনিয়ার চিন্তাবিদ মহলে বইটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায় উক্ত বইটির নামকরণ করা যায়, 'সভ্যতার সংঘাত ও পৃথিবীর পুনর্গঠন'। এই বইটি সম্পর্কে আমেরিকার বিখ্যাত ইয়াহূদী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ হেন্‌রী কিসিঞ্জার, অন্যান্য ইয়াহূদী নেতৃবৃন্দ ও ইয়াহূদী প্রভাবিত পত্রিকাগুলো প্রশংসার স্রোত প্রবাহিত করেছে। এই বইটি নাকি আমেরিকায় জাতিয় পর্যায়ে সর্বাধিক বিক্রিত বই। বইটিতে তিনি আমেরিকা ও ইসলাম সম্পর্কে যা লিখেছেন এবং অমুসলিমদের যে পরামর্শ দিয়েছেন, তার মূল কথাগুলো নীচে উল্লেখ করছি।

'ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকার সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে সারা বিশ্বে সার্বজনীন সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী আমেরিকাই পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা দুনিয়ার সকল জাতির কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করে এক বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এই সভ্যতা বর্তমানে সারা দুনিয়ার ওপর বিজয়ী হয়েছে এবং সকলেই এর দ্বারা প্রভাবিত। সমাজতন্ত্রের পতনের পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতন্ত্র সারা দুনিয়ায় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম, ইসলামী দল ও সংগঠনসমূহ যে গতিতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র মারাত্মক হুমকি বিশেষ। পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে নতুন বিশ্ব গড়ার পথে ইসলামই একমাত্র শক্তি, যা পাশ্চাত্যের গতি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সমাজতন্ত্র ছিলো একটি সাময়িক সমস্যা বিশেষ। এখন তা শেষ, কিন্তু ইসলাম গত ১৫০০ শত বছরব্যাপী স্বকীয় শক্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে

দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে। সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইসলাম বেশ শক্তিশালী বলেই প্রমাণ হচ্ছে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে এর সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং নতুনভাবে যারা দুনিয়াকে গড়তে আগ্রহী, তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং ইসলামের উত্থানকে যে কোনো প্রকারে প্রতিহত করার পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করতে হবে।'

ইয়াহূদী প্রভাবিত উক্ত লোকটির পরিকল্পনা অনুসারে অমুসলিম দুনিয়া বহুপূর্ব থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেছে এবং এরই বাস্তব প্রমাণ হিসেবে আমরা ইসলামী বিশ্বে বর্তমানে যা ঘটছে তা দেখতে পাচ্ছি। পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে উন্নয়ন ব্যহত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পরনির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী মুসলিম দেশগুলোকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম দেশসমূহের নিজস্ব স্বাধীনতা নেই, তাদের উৎপাদিত অস্ত্র ক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অমুসলিম দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হচ্ছে এতে কেনো আপত্তি নেই, মুসলিম দেশকে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে দেয়া হবে না বলে হুঙ্কার ছাড়া হচ্ছে।

ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর এ লক্ষ্যেই হারজেগোভিনা-বসনিয়ায় নির্মম গনহত্যা অনুষ্ঠিত করে অগণিত মুসলিম হত্যা করা হয়েছে। ইসরাঈলকে পারমাণবিক অস্ত্র ভান্ডারসহ মুসলমানদের কলিজার ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিলো ইরাক। সেদেশের মাথা মোটা শাসকের মাধ্যমে কুয়েত দখল করানো হলো। তারপর কুয়েত উদ্ধারের নামে উড়ে এসে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হলো। এসব কিছুই করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার লক্ষ্যে।

মুসলিম দেশসমূহে নানা মতবাদ-মতাদর্শের রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ দলকে সর্বোতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। আফ্রিকান মুসলিম দেশ আলজেরিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামপন্থী দল বিজয়ী হলো, কিন্তু ক্ষমতায় বসার পূর্বেই বদিয়াফ নামক এক জালিমকে ২৬ বছর পর ইঁদুরের গর্ত থেকে বের করে এনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে ইসলামের উত্থান রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তুরস্কের মুসলমানদের ওপরও খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ইরান, সিরিয়া ও মিশরকেও হুমকির মুখে রাখা হয়েছে।

উপমহাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার লক্ষ্যে আফগানিস্থান ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়

ক্ষমতায় এক ক্রীতদাসকে বসানো হয়েছে। ভারতের সাথে ইসরাঈলের গাঁট ছড়া বেঁধে দিয়ে ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। ফিলিস্তিনী ও কাশ্মিরী মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদ' নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার লক্ষ্যে বহুপূর্ব থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ বলয়ভুক্ত লোক তৈরী করে তাদেরকে নানা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেও যখন বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ রোধ করা যাচ্ছে না, তখন 'আল্লাহর আইন চালুর' নামে শুরু করা হয়েছে বোমাবাজি। এসব কিছুর একমাত্র লক্ষ্য, ইসলামী পুনর্জাগরণ রোধ করা।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, বাংলাদেশের সকল ইসলামী দল অবশ্যই আল্লাহর আইন চায় এবং এ লক্ষ্যেই তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন, সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনালগ্ন থেকে কোনো একটি ইসলামী দলও সন্ত্রাসী কোনো কর্মের সাথে জড়িত হয়েছে, এমন প্রমাণ কেউ কি উপস্থিত করতে পারবে?

পারবে না জেনেই ইসলামী লেবাসধারী লোকদের ভাড়া করে 'আল্লাহর আইন চালু'র শ্লোগান দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং দোষ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী দলগুলোর ঘাড়ে। ভারতের সাথে ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল সামরিক চুক্তিসহ নানা ধরনের সহযোগিতা চুক্তি করেছে এবং বর্তমানে বহু সংখ্যক ইয়াহূদী বিশেষজ্ঞ নানা ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার লক্ষ্যে ভারতে অবস্থান করছে। সংখ্যালঘু ইয়াহূদীদের পক্ষে দুনিয়াব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করা সম্ভব নয় বিধায় তারা কৌশলের মাধ্যমে খৃষ্টান ও মুশরিকদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে মূল লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তারা মক্কার মুশরিক ও মদীনার মুনাফিকদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।

সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী কর্মকান্ড ঘটিয়ে বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে এ দেশকে দখল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। আসমুদ্র হিমাচল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাসী ভারত কোনো দিনই প্রতিবেশী হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিবে না। ভারতীয় কংগ্রেসের এক সময়ের সভাপতি মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব রচিত 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম' নামক গ্রন্থে তিনি এ ব্যাপারে ভারতের মনোভাব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জনপ্রিয় দাবিকে সন্ত্রাসের মোড়কে আবৃত করে বিতর্কিত করা তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফসল।

ইসলাম ও ধর্মান্ধতা

পৃথিবীতে ইসলামই হলো একমাত্র-কেবলমাত্র সেই মতবাদ-মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা, যে জীবন ব্যবস্থায় অসহনশীলতা, অসহিষ্ণুতা, গোড়ামী, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা ইত্যাদির কোনো স্থান নেই। যেসব উপকরণে মানুষ অসহিষ্ণু ও উগ্র হয়ে ওঠে, গোড়ামী করে ও এক সময় মানুষকে পরমত অসহিষ্ণু করে তোলে। এবং পরিশেষে তা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের আকার ধারণ করে সেসব ঘৃণ্য উপকরণ ইসলামে নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম সম্পর্কে বলেন–

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-دِيْنًا قِيَمًا-

(হে রাসূল!) বলো, আমার মালিক নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভুল পথ দেখিয়েছেন, সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে নির্ভুল দ্বীন, এর মধ্যে বক্রতার কোনো স্থান নেই। (সূরা আনআম-১৬১)

ইসলাম মানুষের অসাধ্য, মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত বা মানব স্বভাবের বিপরীত একটি নিয়ম-নীতি বা বিধানও মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। বরং ইসলাম ঘোষণা করেছে–

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا-

আল্লাহ তা'য়ালা কখনো কাউকেই তার শক্তি-সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেননা। (সূরা বাকারা-২৮৬)

আত্মার মুক্তি-পরকালের মুক্তির নামে মানব স্বভাবের বিপরীত বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করা, আল্লাহর সৃষ্ট বিভিন্ন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা তথা আত্ম নির্যাতনের পথ থেকে মানুষকে ইসলামই ফিরিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন–

لاَرَهْبَانِيَةَ فِى الاِسْلاَمِ-

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। (মুসনাদে আহ্মাদ)

কিছু সংখ্যক মানুষ আত্মার মুক্তির নামে এমনভাবে আত্মনির্যাতন করে যে, হালাল খাদ্য গ্রহণ করা থেকে তারা বিরত থাকে। এই ধরনের ধর্মান্ধতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বারবার প্রশ্নের আকারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'য়ালা যা হালাল করেছেন, এদের ওপরে কে তা হারাম করলো?' আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا-اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো

হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলো নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়ো না, আর কখনো সীমালংঘন করো না। অবশ্যই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের অপসন্দ করেন। (সূরা মায়িদা-৮৭)

ইসলামে ধর্মান্ধতা নেই, রয়েছে উদারতা ও নমনীয়তা। এ জন্যেই ইসলামকে বলা হয়েছে 'স্বভাব ধর্ম।' মানুষের স্বভাবের বিপরীত একটি রীতিও ইসলামে নেই। একজন সাহাবী অন্যদের লক্ষ্য করে নিজের সম্পর্কে বলছিলেন, আমি সারা জীবন রাতে না ঘুমিয়ে নামায আদায় করবো। আরেকজন বললেন, আমি সারা জীবন রোযা পালন করবো। কখনো রোযা ভাঙবো না। আরেকজন বললেন, আমি কখনোই বিয়ে করবো না এবং নারীর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবো না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এসব কথা শুনতে পেয়ে ঐ লোকদের বললেন, আল্লাহর নামের শপথ! আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে অনেক বেশী ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এরপরও আমার জীবনধারা এই যে, আমি রোযাও পালন করি এবং ভেঙেও ফেলি। রাতে নামাযও আদায় করি এবং নিদ্রাও উপভোগ করি। নারীদের বিয়েও করি। আমার এই জীবনধারা যার পসন্দ নয়, তার সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। (বুখারী-মুসলিম)

ইসলাম ধর্মান্ধতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং ক্ষণকালের জন্যেও তা বরদাস্ত করেনি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

لَاتُشَدِّدُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ–

নিজেদের ওপর কঠোরতা করো না, অন্যথায় আল্লাহই তোমাদের ওপর কঠোরতা করবেন। (আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাবধান! দ্বীনে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। (নাসাঈ)

মানুষের জন্য ইসলাম কত সুন্দর ও সহজ বিধান দিয়েছে। রোগগ্রস্ত কোনো মানুষ পানি দিয়ে অযু করলে যদি রোগ বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে অথবা এমন স্থান যেখানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না, এ অবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে। রোগীর ও মুসাফিরের জন্য রোজা ফরজ করা হয়নি। পূর্ণ বয়স্কা নারীর প্রত্যেক মাসে যে ঋতুচক্র হয়, এ অবস্থায় অন্যান্য ধর্ম তাকে চরম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এমনকি সেই নারীকে পৃথিবীর মাটিও স্পর্শ করতে না দিয়ে উঁচু স্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। সে নারী পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করলে পৃথিবী নাকি অপবিত্র হয়ে যাবে। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ এ অবস্থায় উপনীত হলে তিনি তাঁদের কোলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছেন। স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য সংগত কারণেই স্ত্রী এ অবস্থায় উপনীত হলে তাদের সাথে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলাম সেই মুসলমান তৈরী করেছে, অমুসলিমদের হাতে পানি পান করলে, তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে আহার করলে যাদের 'জাত' যায় না। অমুসলিমদের পবিত্র কাপড় পরিধান করে, তাদের বাড়িতে পবিত্র স্থানে নামায আদায় করলেও মুসলমানদের 'জাত' যায় না। মুসলমানদের মসজিদে যে কোনো ধর্মের লোক পবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করলেও মসজিদ অপবিত্র হয় না। পবিত্র কোরআন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য, শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে অবশ্যই নয়। কোরআন নিজের সম্পর্কে নিজেই ঘোষণা করেছে, 'হুদাল্লিন্ নাস' এটি মানুষের জন্য হিদায়াত।

প্রতিবেশী দেশে হিন্দু হয়েও নিজেদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পায় না এবং নিজের ধর্মগ্রন্থও স্পর্শ করতে পারে না। থাইল্যান্ডের রাজকুমারী মহাচক্রী শিরিনধর্ণ জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত অর্থাৎ কুটনৈতিক মর্যাদার অধিকারী। বিশ্বব্যাপী শান্তির জন্যে কাজ করার কারণে তাকে ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে সে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজকুমারীকে জাতিসংঘ ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সফরে পাঠিয়েছিলো। সারা ভারতব্যাপী বহু বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। অধিকাংশ বৌদ্ধ মন্দিরের পরিচালক মন্ডলী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। রাজকুমারী মহাচক্রী শিরিণধর্ণ ভারতের পুরী এলাকায় কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শনে গেলে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাকে 'বিদেশী' আখ্যায়িত করে মন্দিরে প্রবেশে বাধা দেয়। এরপর তিনি উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির 'লিঙ্গরাজ' পরিদর্শনে যান। সেখানেও তাকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। রাজকুমারী স্বয়ং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় 'সংস্কৃত এবং পালি' ভাষায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন বিশেষজ্ঞ। ধর্মগ্রন্থের ভাষায় বিশেষজ্ঞ এবং স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও তাকে মন্দির পরিদর্শন করতে দেয়া হয়নি। বিষয়টি ২৫ নভেম্বরের প্রায় সকল পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছিলো।

জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূতের সাথে এই ধরনের আচরণ যদি বাংলাদেশে করা হতো, তাহলে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো এবং তাদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বীরা বাংলাদেশকে 'জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদীদের অভয়ারণ্য' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রচার করতো। এমনকি স্বয়ং জাতিসংঘও হয়ত এ দেশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। ভারত যেহেতু অমুসলিম রাষ্ট্র, সেহেতু উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতকে সামান্য বিব্রতবোধও হতে হয়নি এবং বিষয়টি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রচারও করা হয়নি।

ইসলাম এ ধরনের ঘৃণ্য কার্যকলাপ মোটেও বরদাস্ত করে না এবং কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা গোড়ামীকে প্রশ্রয় দেয়না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

لَاإِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ-قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ-

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, কারণ সত্য এখানে মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। (সূরা বাকারা-২৫৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি অবিচার করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং ঐ অমুসলিমের পক্ষে আর মুসলিমের বিপক্ষে আল্লাহর আদালতে দাঁড়াবো।

পবিত্র কোরআন ও হত্যাকান্ড

আল্লাহর আইন চালু করার নামে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং জঙ্গী কায়দায় মানুষ হত্যা করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সম্পর্কে 'অকার্যকর, ব্যর্থরাষ্ট্র, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদীদের আস্তান, উগ্রপন্থীদের অভয়ারণ্য, সাম্প্রদায়িক দেশ' ইত্যাদি ধরনের অপপ্রচার করে থাকে, তাদের হাতের পুতুল হিসেবেই বোমা মেরে মানুষ হত্যা করছে। এসব লোকদের অবস্থা মহাকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ)-এর ভাষায়–

উনহিকা মাহফিল সাঁওয়ার তা হুঁ, চেরাগ মেরি হ্যায় রাত উনকি
উনহিকা মাত্‌লব কাহ্‌রাহা হুঁ, জবাঁ মেরী হ্যায় বাত্‌ উনকি।

অর্থাৎ এই অনুষ্ঠান আমার নয় অন্যজনের আর অন্যজনের রাতের অন্ধকার দূর করার জন্য আমি আমার প্রদীপ জ্বালাই। অন্যজনের উদ্দেশ্য ও কথা প্রকাশ করার জন্য আমি আমার জিহ্বা ব্যবহার করি।

ইসলামের নামে যারা বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা, দেশে অরাজকতা, বিপর্যয় ও জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, তাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যে শিকার করা হচ্ছে, এ বিষয়টি তারা অনুভব করতে পারছে না। স্থবির চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন ও স্থূল বুদ্ধির অধিকারী এসব লোক কিছু বিনিময়ের আশায় অথবা সওয়াবের নিয়তে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিজেরা ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং এ জঘন্য কাজটি যে কতটা ভয়াবহ, মহান আল্লাহ তা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ، بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا-وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا-

(বৈধ কারণ ব্যতীত) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেনো সমস্ত মানুষকেই হত্যা করলো। আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে, তবে সে যেনো সমস্ত মানুষকেই জীবন দান করলো। (সূরা মায়িদা-৩২)

পৃথিবীতে মানব জাতির সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে একটি বিষয়ের ওপর যে, প্রত্যেক মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় অন্য মানুষের প্রতি সম্মান-মর্যাদাবোধ থাকবে, অন্যের জীবন রক্ষা ও স্থিতির ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং অন্যের জন্যে পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। কেউ যেনো নিরাপত্তাহীন হয়ে না পড়ে এবং আতঙ্কিত না হয়, সে ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে।

যে ব্যক্তি সন্ত্রাসের মাধ্যমে একজন মানুষকে হত্যা করে, সে কেবল একজন মানুষকেই হত্যা করে না, বরং একজন মানুষকে হত্যা করে সে এ কথাই প্রমাণ করে যে, তার মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় পৃথিবীর অন্য মানুষের প্রতি সামান্যতম সম্মান-মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির চিহ্নমাত্র নেই। এ কারণে সেই হত্যাকারী ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবতার শত্রু হিসেবেই বিবেচিত হয়। কারণ, এই ধরনের ব্যক্তি যে দোষে আক্রান্ত, অন্যান্য মানুষের মধ্যে সেই দোষের বিস্তৃতি ঘটলে মানব জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবার প্রশ্ন দেখা দিবে।

অপরদিকে যে ব্যক্তি অন্যের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করে, তাকে নিরাপত্তা, অভয়, শান্তি-স্বস্তি দান করে এবং শঙ্কামুক্ত পরিবেশের নিশ্চয়তা দেয়, সে ব্যক্তি প্রকৃতই মানুষের বন্ধু। কারণ এই ধরনের উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যই ইসলাম মানুষের মধ্যে কামনা করে এবং এই গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই মানব মন্ডলীর স্থিতি, সুরক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

পৃথিবীতে মানুষ হত্যার সূচনা হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের এক পুত্র থেকে। একভাই আরেক ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো এবং এ কারণেই সে প্রথম মানুষ হত্যাকারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের ঘৃণা কুড়াবে। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, হিংসার বশবর্তী হয়ে প্রথমজন যখন দ্বিতীয়জনকে হুমকি দিয়ে বলেছিলো, 'আমি তোমাকে হত্যা করবো।' দ্বিতীয়জন বলেছিলো, তুমি যদি হত্যার উদ্দেশ্যে আমার ওপর হাত উঠাও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার ওপর হাত উঠাবো না। কারণ আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

দ্বিতীয়জনের কথার অর্থ হলো, 'তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করে থাকো, করতে পারো। এটা আমি জানার পরও আমি তোমাকে প্রথমেই হত্যা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবো না।' সূরা মায়িদার ২৭ থেকে ৩১ নম্বর আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, হত্যাকারীর সম্মুখে নিজেকে স্বেচ্ছায় সোপর্দ করা, সন্ত্রাসী-জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা অথবা আত্মরক্ষার চেষ্টা না করা শান্তি প্রিয় মানুষের কাজ নয় বা সওয়াবের কাজও নয়। যদি কোনো ব্যক্তি জানতে পারে

যে, অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে এবং সময়-সুযোগ এলে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে সে যদি হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রথমেই হত্যা না করে, তাহলে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও যদি না করে, তাহলে তো সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে জালিমের হাতে সোপর্দ করলো। এ জন্যই হযরত আদম (আঃ) -এর পুত্রদের মধ্যে হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণকারী এক পুত্রকে আরেক পুত্র বলেছিলো–

اِنِّـىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُـوْءَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَـتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ– وَذٰلِكَ جَزٰؤُ الظّٰلِمِيْنَ–

আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের পাপ তুমি একাই নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও ও জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে থাকো, জালিমদের জুলুমের এটাই উপযুক্ত স্থান। (সূরা মায়িদা-২৯)

অর্থাৎ আমি জানলাম যে, তুমি আমাকে হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছো। কিন্তু এ কথা জেনেই আমি তোমাকে হত্যা করে আল্লাহর কাছে প্রথম হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জাহান্নামে যেতে ইচ্ছুক নই। হত্যাকান্ডের মতো জঘন্য কর্ম করে জাহান্নামে যাবার ইচ্ছে থাকলে তুমিই এই অপকর্ম করে জাহান্নামে নিজের বাসস্থান তৈরী করো। আর খুনী জালিমদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।

মানুষ হত্যা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করে জান্নাতে যাওয়া যাবে, মূর্খ-অশিক্ষিত লোকদের এই ধারণা যারা দিয়েছে– তারা অবশ্যই সমগ্র মানবতার দুশমন এবং এসব লোকের ঠিকানা জাহান্নাম। অকারণে মানুষকে হত্যা করা, দেশ ও সমাজে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, সন্ত্রাস, বিপর্যয় সৃষ্টি করে মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করা এবং জনজীবন বিপর্যস্ত করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার অনুরূপ অপরাধ। আর এই অপরাধে অপরাধিদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا جَزٰؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ–ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ–

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে

নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়, কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এটা অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা মায়িদা-৩৩)

হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পুত্রের হাতে প্রথম নররক্ত প্রবাহিত হয় এবং এ কারণেই পৃথিবীতে যত হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে, সকল হত্যাকান্ড সংক্রান্ত পাপের একটি অংশ সে নিজে মাথায় বহন করে জাহান্নামে যাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, 'যখনই কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তখনই এর পাপের একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদম আলাইহিস্ সালামের পুত্রের ওপর বর্তাবে। কারণ সেই সর্বপ্রথম মানুষ হত্যার সূচনা করেছে।' (বোখারী-মুসলিম)

জেনে বুঝে ঠান্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করছে–

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا–

যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে জেনে বুঝে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা নিসা-৯৩)

কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী একমাত্র বৈধ কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করতে পারবে না এবং কেউ যদি তা করে, তাহলে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ–وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا– يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا–

তারা আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে যে হত্যঅ করে না এবং ব্যভিচার করে না, এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার জন্য এ শাস্তি আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল থাকবে। (সূরা ফোরকান-৬৮-৬৯)

মানুষের ইতিহাসে এই মানুষই দারিদ্রতার ভয়ে এবং অন্যান্য কারণে নিজ সন্তানকেও হত্যা করতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেন, তখন পর্যন্তও এই অমানবিক প্রথা সে সমাজে

চালু ছিলো। এই জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজ থেকে ইসলামই মানুষকে বিরত করেছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ-نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ- اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا-

তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি যেমন তাদের রিয্‌ক দান করি তেমনি তোমাদেরও রিয্‌ক দান করি। তাদের হত্যা করা অবশ্যই একটি মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩১)

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ-

দারিদ্রের আশঙ্কায় কখনো তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার যোগাই। (সূরা আনআম-১৫১)

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ-

আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্য মর্যাদাবান করেছেন, তা যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। (সূরা আনআম-১৫১)

হাদীসে নববী ও হত্যাকান্ড

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হিসেবে দাবি করে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করার মতো কাজে নিজেকে জড়িত করা আত্মপ্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়। অকারণে একজন মানুষকে হত্যা করা সারা দুনিয়া মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়ার থেকেও ভয়াবহ অপরাধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَزَوَلُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنُ بِغَيْرِ حَقِّ الْمُؤْمِنُ اَكْرَمَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ الَّذِيْنَ عِنْدَهِ-

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অবস্থানকারী ফেরেশ্‌তাদের চাইতেও সম্মানিত। অন্য কোনো মুমিন ব্যক্তির রক্তের বিনিময় ব্যতীত তাকে হত্যা করা অপেক্ষা দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াও আল্লাহর নিকট অনেক সহজ।

আল্লাহর আইন চালুর ধুয়া তুলে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা হচ্ছে যে, 'আমি সওয়াবের কাজ করেছি এবং সঠিক পথেই আছি।' এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করে যে, সে সঠিক পথের ওপর রয়েছে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার কোনো ইবাদাত এবং দান-সাদকা গ্রহণ করবেন না। (আবু দাউদ)

হযত আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রতিদিন প্রত্যুষ্যে শয়তান তার সহকর্মীদের বিভিন্ন কাজ দিয়ে ছড়িয়ে দেয় এবং বলে, যে আজ কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে অপদস্থ করতে পারবে তাকে আমি সম্মানের মুকুট পরিধান করাবো। তারপর শয়তানদের মধ্য থেকে কেউ এসে বলে, আমি আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। এ কথা শুনে ইবলিস জবাব দেয়, তুমি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারনি, কারণ তারা পুনরায় কাউকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করবে। আরেকজন এসে জানায়, আমি সন্তানের মাধ্যমে পিতামাতার সাথে রূঢ় আচরণ করিয়েছি। জবাবে ইবলিস বলে, এটা তেমন কোনো কাজই নয়, ঐ সন্তান ক্ষমা চেয়ে পিতামাতার আনুগত্য করবে। ইবলিসের কোনো সহকর্মী এসে জানায়, আমি অমুক ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর সাথে শির্‌ক করিয়েছি। ইবলিস শয়তান তখন বেশ খুশী হয়ে বলে, তুমি কাজের মতো একটি কাজ করেছো, এটা উত্তম কাজ। কেউ যখন এসে জানায়, আমি অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছি। ইবলিস শয়তান মহাখুশী হয়ে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি খুবই ভালো কাজ করেছো, তুমি আমার প্রিয়পাত্র।

ইচ্ছাকৃতভাবে যারা মানুষ হত্যা করবে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّغْفِرَهُ اِلاَّ الرَّجُلُ يَمُوْتُ مُشْرِكًا اَوِالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا-

সমস্ত গোনাহ্ আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে মুশরিক অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে এবং ঐ ব্যক্তি যে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা সব ধরনের গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কাফির অবস্থায় ইন্তেকাল করবে অথবা ঐ ব্যক্তি যে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ এসব লোককে ক্ষমা করবেন না।

হযরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ-

একজন মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট অধিকতর ভয়াবহ সারা দুনিয়া ধ্বংস হবার চেয়েও। (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যদি আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা একজন মুমিন ব্যক্তির হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সকলকে অধোমুখী করে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন–

اَوَّلُ مَا يَقْضٰى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ–

কিয়ামতের দিনে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিচার করা হবে, তা তাদের মধ্যে সংঘটিত রক্তপাত ও হত্যার বিচার। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু বাকরাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি সকল আসমানের ও যমীনের অধিবাসী একত্রিত হয়ে কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সকলকে তাদের মুখের ওপর উপুড় করে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অতি সহজ, একজন মুসলিম ব্যক্তি হত্যার চেয়ে। অর্থাৎ একজন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ।

এ ধরনের অনেকগুলো হাদীস ইমাম মুনজীরী (রাহঃ) তাঁর রচিত তারগীব ও তারহীব নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অন্যায়ভাবে যারা মানুষ হত্যা করে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বের হয়ে আমার উম্মতের সৎ ও অসৎ লোক তথা নির্বিশেষ সকলকে হত্যা করতে থাকবে, সে আমার উম্মতের মধ্য গণ্য নয়। আর আমিও তাদের মধ্যে গণ্য নই। (মুসলিম)

যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা করবে, এই হত্যাকান্ড হাশরের ময়দানে বিচার শেষে তার আর জান্নাতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। (বোখারী)

বোমা মেরে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও মানুষ হত্যা করে শহীদ হয়ে জান্নাতে যেতে চাওয়া যারা শিখিয়েছে, জান্নাত তো দূরে থাক, তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ কয়েক হাজার মাইল দূর থেকেও অনুভব করা যাবে। ভুল পথে আন্দোলন করে, গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার মধ্যে জান্নাত নেই। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর গোলামী, অন্যের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেয়ার মধ্যেই রয়েছে জান্নাত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৯ই জিলহজ বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনমন্ডলীকে প্রশ্ন করতে থাকেন, তোমরা কি জানো, আজকের দিনটি কোন্ দিন?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আজকের দিন কোরবানীর দিন নয় কি? উপস্থিত লোকজন বললেন, জ্বি, আজ কোরবানীর দিন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কোন্ মাস? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর নবী বললেন, এটা কি হজের মাস নয়? জনমন্ডলীর মধ্য থেকে জবাব এলো, জ্বি, এটা হজের মাস।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় প্রশ্ন করলেন, এটা কোন্ শহর? উপস্থিত লোকজন বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর হাবিব বললেন, এটা কি নিরাপত্তা ও সম্মানের শহর নয়? সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, বললেন, জ্বি, এটা নিরাপত্তা ও সম্মানের শহর। এবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, এই দিনে, এই মাসে ও এই শহরে যেভাবে তোমাদের পরস্পরের প্রতি একে অপরের প্রাণ, ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, সম্ভ্রম হারাম তেমনিভাবে আজ থেকে তোমাদের একে অপরের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা বিনষ্ট করা হারাম। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মালিকের সান্নিধ্যে পৌঁছে যাও। আমার বিদায়ের পরে তোমরা কাফির হয়ে একে অপরকে হত্যাকান্ডে লিপ্ত হয়ো না। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, যে লোক আমাদের ওপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। (বোখারী-মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ–

মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া সীমালংঘনমূলক কাজ, আর তাকে হত্যা করা কুফুরী কাজ। (মুসলিম)

কেউ যদি কোনো মুসলমানকে গালি দেয়, তাহলে ফাসিক হয়ে যাবে আর যদি হত্যা করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আল্লাহর নবী বলেন, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণার পাত্র হলো তিন ধরনের লোক। (১) হারাম শরীফে অনধিকার চর্চাকারী বা অন্যায়কারী। (২) ইসলামের মধ্যে জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতি অনুসন্ধানকারী। (৩) অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের রক্ত প্রবাহকারী। অর্থাৎ মানুষ হত্যাকারী। (বোখারী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাত ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে মুক্ত থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, সেই সাত ধরনের কাজগুলো কী কী? আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা। যাদু করা।

কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা– যা আল্লাহ হারাম করেছেন। সুদ খাওয়া। ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। জিহাদের ময়দান থেকে ভয়ে পালিয়ে আসা। সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (বোখারী)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, তোমরা আমার হাতে হাত রেখে এই শর্তের ওপর বাইয়াত করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ব্যভিচার করবে না। চুরি করবে না। অন্যায়ভাবে কোনো জীবন হত্যা করবে না– যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তোমাদের যে কেউ এসব শর্ত পূর্ণ করবে, তার সওয়াব আল্লাহ দিবেন। আর তোমাদের কেউ যদি এ ধরনের অন্যায় কাজ করে বসে, তাহলে তাকে দুনিয়াতে বিনিময় হিসেবে বদলা নেয়া হবে। তবে এ বদলা তার গোনাহ মাফের কারণ হবে। আর কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে এবং আল্লাহ গোপন রাখেন, (যদি প্রকাশ হয়ে না পড়ে) তাহলে বিচার আল্লাহর কাছে। তিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। (মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন–

لَايَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِىْ نَسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِهِ مَالَمْ يَصُبْ دَمًا حَرَامًا–

মুমিন ব্যক্তি সবসময় তার দ্বীনের প্রশস্ততার মধ্যে অবস্থান করবে (দ্বীনের সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করবে) যতক্ষণ না হারাম নরহত্যার অপরাধ করে। (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুইজন মুসলমানের একজন যখন অপর মুসলমানের প্রতি অস্ত্র ধারণ করে তখন তারা দুইজনই জাহান্নামের প্রান্তে পৌঁছে যায়। এরপর একজন যখন অপরজনকে হত্যা করে, তখন দুইজনই জাহান্নামে যায়। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি হত্যাকারী সে তো জাহান্নামে যাবে, এটা বুঝলাম কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টি বুঝলাম না। আল্লাহর নবী বললেন, اِنَّهُ اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ সেও তো তার সাথীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। (বোখার, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুনের ঘটনা দেখলে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ হত্যাকান্ডে বাধা না দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তার সম্পর্কে বলেছেন–

لَايَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مُوْقِفًا يُقْتَلُ فِيْهِ رَجُلٌ ظُلْمًا فَاِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ–

যেখানে কোনে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, সেখানে যেনো কেউ উপস্থিত না থাকে। কারণ এ হত্যাকান্ডের সময় যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না, তার ওপরও অভিশাপ অবতীর্ণ হবে। (বায়হাকী)

অর্থাৎ অবৈধ রক্তপাত তথা হত্যাকান্ডে লিপ্ত হলে সে ব্যক্তি আর মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। কোরআন-হাদীসে মানুষ হত্যা সম্পর্কিত বহু সতর্কবাণী রয়েছে। এসব সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সওয়াবের নিয়তে মানুষ হত্যা করা আর আল্লাহর দ্বীনের সাথে প্রহসন করা একই কথা। এ ধরনের কাজ যারা করছে তারা অবশ্যই যালিম এবং কোরআন-হাদীসের আইন অনুযায়ী এসব যালিমদের প্রকাশ্যে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করা একান্তই প্রয়োজন। যেনো শাস্তির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আর কেউ কারো প্ররোচনায় ভুল পথে অগ্রসর না হয়।

ইসলাম ও সুইসাইড স্কোয়াড

বর্তমান পৃথিবীতে মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞানীগণ নানা ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে এবং এসব ব্যবহার করে মানুষকে বাঁচানোর জন্য কতই না প্রচেষ্টা। কারণ জীবনের মূল্যের কোনো তুলনাই নেই, জীবন বড়ই মূল্যবান। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, এই মানুষ অন্যকে যেমন অন্যায়ভাবে হত্যা করার ইখতিয়ার রাখে না তেমনি সে নিজেকেও হত্যা করতে পারে না। অন্য মানুষকে হত্যা করা যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং বড় ধরনের গোনাহ্, অনুরূপভাবে আত্মহত্যা করাও মারাত্মক গোনাহ্ ও অপরাধ। মানুষ স্বয়ং তার প্রাণের মালিক নয় এবং এই প্রাণকে সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী শেষ করে দিতে পারে না। শুধুতাই নয়, নিজের প্রাণকে সে অনুপযোগী কোনো কাজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখে না।

এই পৃথিবী মানুষের জন্য এক পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা যেমনভাবেই পরীক্ষা গ্রহণ করুন না কেনো, সেভাবেই মানুষকে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন নিজের ইচ্ছামাফিক প্রশ্নপত্র তৈরী করে পরীক্ষা দেয়া যায় না, অনুরূপভাবে এই পৃথিবীতেও আল্লাহর পরীক্ষায় ইচ্ছে অনুযায়ী অংশগ্রহন বা বিরত থাকা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া করে মানুষের যে জীবনকাল নির্ধারণ করেছেন, তা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহারও করা যাবে না। পরীক্ষা ক্ষেত্র এই পৃথিবী থেকে নিজেকে ইচ্ছে অনুযায়ী সরিয়ে ফেলাও যাবে না এবং এই অধিকার কোনো মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা দেননি।

মানুষ লাঞ্ছনামূলক অবস্থায় নিপতিত হয়ে বা অন্য কোনো মনোকষ্টের কারণে লাঞ্ছনামূলক অবস্থা বা কষ্টের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যই আত্মহত্যা করে।

অথচ সে এ কথা ভুলে যায় যে, সামান্য কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার আশায় আত্মহত্যা করছে, অথচ আত্মহত্যা করে সে ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যেই নিজেকে নিক্ষেপ করছে। যে কষ্টের কোনো তুলনাই এই পৃথিবীতে হয় না। আত্মহত্যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ–

কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যা আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৩)

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্য মর্যাদাবান করেছেন, তা যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। (সূরা আনআম-১৫১)

আত্মহত্যাকারী অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যায়ভাবে অন্যকে হত্যা করলে যেমন জাহান্নামে যেতে হবে, অনুরূপভাবে নিজেকে যারা হত্যা করবে, তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ–اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا–وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَنًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا–

তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা করো না। কারণ আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি অতীব দয়াবান। যে কেউই বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতে গিয়ে এই হত্যার কাজ করে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো। (সূরা নিসা-২৯-৩০)

আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جَرْحٌ فَجَزَعَ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَارَقَا الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ اللّٰهُ– بَادَرَنِيْ عَبْدِيْ بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ–

তোমাদের পূর্বে গত হওয়া মানুষদের মধ্যে একজন ছিলো, সে আহত হলো এবং যন্ত্রণায় বিচলিত হয়ে উঠলো। এ অবস্থায় সে ছুরি ব্যবহার করে নিজেই নিজের হাত কেটে ফেললো। হাত কাটার ফলে এত বেশী রক্তক্ষরণ হলো যে, এতে তার মৃত্যু ঘটলো। আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, আমার এ বান্দা নিজের ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়া করেছে। এ কারণে আমি তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। (বোখারী-মুসলিম)

আরেক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَه فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَه فَسَمُّه فِىْ يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا–وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَه بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُه فِىْ يَدِه يَتَوَجَّاهُ بِهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَلدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا–

যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করলো, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে চিরদিনই পড়ে থাকবে। কখনোই সেখান থেকে মুক্তি পাবে না। যে লোক বিষ পান করে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামের আগুনে চিরকালই নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোনো অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামে চিরকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজেকে আঘাত করতে থাকবে। (বোখারী-মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মহত্যাকারীর জানাযা আদায় করেননি। তিনি একাধিকবার সতর্ক করেছেন যে, আত্মহত্যা করে যে পদ্ধতিতে নিজেকে হত্যা করবে, আখিরাতের ময়দানে বিচার শেষে উক্ত ব্যক্তি সেই পদ্ধতিতেই নিজেকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে নিজেকে কখনো সেদিন হত্যা করতে পারবে না। শুধু কষ্টই ভোগ করবে।

সুতরাং, আল্লাহর আইন চালু করার নামে ইসলামের শত্রু কর্তৃক গঠিত 'সুইসাইড স্কোয়াড'এর সদস্যদের তালিকায় যারা নিজেদের নাম লিখিয়েছে, তারা জাহান্নামীদের তালিকায় নিজেদের নাম লিখিয়েছে। সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করা বা এর সদস্য হওয়ার অনুমতি কি ইসলাম দিয়েছে? সারা দেশের সম্মানিত আলেম-ওলামা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছে এবং যারা এর সদস্য হয়েছে, তারা উভয়েই জাহান্নামী এবং বোমা মেরে কাউকে হত্যা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করছে সেও জাহান্নামী।

ইসলাম ও মৃত্যুদন্ড

ইসলামে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ বিধানও সততা, ন্যায়পরায়নতা, ইনসাফ, নিরাপত্তা, মানবতা, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যেই। একশ্রেণীর লোকজন মৃত্যুদন্ডের বিরোধিতা করে বলে থাকে যে, 'মৃত্যুদন্ডের বিধান

মানবাধিকারের পরিপন্থী।' মানবাধিকারের এসব প্রবক্তারা নিজেদের দেশেও মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে এবং অপরাধীকে কয়েক শত বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়ে থাকে। তাদের কারাদন্ডের বিধান দেখলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, একজন মানুষ জীবিত থাকে কত বছর? মৃত্যুদন্ডের যারা বিরোধিতা করে থাকে, তারাই অসহায় কারাবন্দীদের সাথে হিংস্র পশুর চেয়েও জঘন্য আচরণ করে থাকে। গুয়ান্তানামো বে, আফগানিস্থান ও ইরাকের আবু গারিব কারাগারে তারা কতটা জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে, তা প্রচার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ দেখে শিউরে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে শোনা যাচ্ছে, ইউরোপের কোথাও কোথাও মানবাধিকারের প্রবক্তাদের গোপন কারাগার রয়েছে।

মানুষের প্রাণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিশেভাবে সম্মানিত করেছেন। এ প্রাণকে ধ্বংস করা যাবে না, তবে সত্য ও ইনসাফের প্রয়োজনে ধ্বংস করা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো, সত্য ও ইনসাফের কোন্ অর্থ প্রযোজ্য হলে প্রাণ ধ্বংস তথা মৃত্যুদন্ড প্রযোজ্য হতে পারে? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

আল্লাহ্ তা'য়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্য মর্যাদাবান করেছেন, তা যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। (সূরা আনআম-১৫১)

সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে মৃত্যুদন্ড প্রয়োগের জন্য পাঁচটি মূলনীতি দেয়া হয়েছে। এই পাঁচটি মূলনীতির আওতায় কোনো মানুষ যদি এসে যায়, তাহলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে। মূলনীতিগুলো ঃ–

(১) কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার অপরাধ করে এবং সে কারণে উক্ত হত্যাকারীর ওপর বিনিময় গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

(২) ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথে কেউ যদি বাধা সৃষ্টি করে এবং তার সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে। এ অবস্থায় যুদ্ধে তাকে হত্যা করা ব্যতীত কোনো উপায় না থাকে।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে জঙ্গীপন্থা অবলম্বন, সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি, জনজীবনে আতঙ্ক-অশান্তি সৃষ্টি করে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটানোর চেষ্টা করে।

(৪) বিবাহিত ব্যক্তি যদি যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে বলে প্রমাণ হয়।

(৫) কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।

ইসলাম যেসব দন্ডবিধি ঘোষণা করেছে, তা একক কোনো ব্যক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। ইসলামী রাষ্ট্র আইন-আদালতের মাধ্যম দন্ডবিধি প্রয়োগ করবে। দৃষ্টান্ত

স্বরূপ আব্দুর রহিমের ভাই, পিতা বা সন্তানকে আব্দুর রাজ্জাক হত্যা করলো। আব্দুর রহিমের এ ক্ষমতা নেই যে, সে তৎক্ষনাত আব্দুর রাজ্জাককে হত্যা করবে। আব্দুর রহিম যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা না করে ও রক্তের বিনিময় মূল্যও গ্রহণ করতে রাজি না হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত আব্দুর রাজ্জাককে মৃত্যুদন্ড দিবে ও কার্যকর করবে। দেশের জনগনের এ অধিকার নেই যে, তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিবে। সাধারণ মানুষ যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়, তাহলে তো দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি হবে। ইসলাম কাউকে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার সুযোগ দেয় না।

যে কয়টি কারণে ইসলামে মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে, এই বিধানও কার্যকর করা হবে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে। আদালত রায় দিবে এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির মাধ্যমে রায় কার্যকর হবে।

বর্তমানে যারা ইসলামের নামে বোমা সন্ত্রাস করছে, তারা মূলত এদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথে চরম বাধাই সৃষ্টি করছে। এরা দেশের উন্নয়ন ব্যহত করছে, বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ করার চেষ্টা করছে, নাগরিক জীবন নিরাপত্তাহীন করছে এবং নাগরিক জীবনে ভয়-ভীতি, শঙ্কা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে যে অপরাধ করছে তাতে করে ইসলামের মৃত্যুদন্ডের বিধান তাদের প্রতিই প্রযোজ্য।

সন্ত্রাসবাদের জনক

পৃথিবীতে পরিকল্পনা ভিত্তিক সংগঠিত সন্ত্রাসী তৎপরতা কবে কোথায় কোন্ দেশে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিলো এবং কোন্ শ্রেণীর লোকজন সন্ত্রাস নামক ভয়াবহ দানবের পিঠে সওয়ার হয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলো, এ সম্পর্কে সন্ত্রাস বিশারদগণই অধিক অবগত আছেন। তবে মানব সভ্যতার বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত রয়েছেন এবং আধুনিক বিশ্বের চলমান ঘটনাবলীর প্রতি যারা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, তাদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বর্তমান পৃথিবীতে সন্ত্রাস নামক দানব কোন্ জাতির গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং কারা একে লালন-পালন করে বর্ধিত-কুৎসিত অবয়বে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

পবিত্র কোরআন ও ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এ কথা জানে যে, বনী ইসরাঈলী তথা ইয়াহূদী জাতিকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিলেন। কিন্তু তারা সেই নে'মাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে অবহেলা-অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকে। চরম পন্থা অবলম্বনকারী ইয়াহূদী জাতির অপকর্ম সীমা লংঘন করার পর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাদের ওপর নেমে আসে অভিশাপ এবং এরপরই শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত যাযাবরের জীবন। ইতিহাস কথা বলে। বিগত দুই হাজার বছর বা তারও অধিককাল ধরে তারা চরম অভিশপ্ত

জীবন-যাপন করে আসছে। তাদের এই ঘৃণ্য পরিণতি বরণ করার কথা ছিলো না, কারণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বার বার তাদের অপরাধ ক্ষমা করে অনুগৃহীত করেছেন এবং সহজ-সরল পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলোকবর্তিকা স্বরূপ তাদের মধ্যে অসংখ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু হতভাগা ইয়াহূদীরা বারবার আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে সকল সীমারেখা এমন উগ্রভাবে লঙ্ঘন করেছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা জেনে বুঝে ঠান্ডা মাথায় নবী-রাসূলদের হত্যা করে পবিত্র নবী-রাসূলের কাটা মাথা প্লেটে সাজিয়ে বাঈজীর সম্মুখে উপহার দিয়েছে। এমন অভিশপ্ত ও নিকৃষ্টমনা জাতির জীবনে যদি ক্রমাগত বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় নেমে আসে, তাহলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইয়াহূদীরা প্রথমে বাস করতো সিরিয়া ভূখন্ডে। অপকর্মের কারণে আমালিক সম্প্রদায় তাদেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করলে তারা মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেও এই পথভ্রষ্টদের ওপরে নেমে এসেছিলো আরেক অভিশপ্ত শাসক ফিরআউনের নৃশংস নিরবচ্ছিন্ন নিগ্রহ। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া করে হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামকে সেখানে প্রেরণ করলেন তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য।

মহান আল্লাহর সানুগ্রহ অভিপ্রায়ে হযরত মূসার নেতৃত্বে যখন অলৌকিকভাবে লোহিত সাগড় পাড়ি দিয়ে ইয়াহূদীরা স্বাধীন নিঃশ্বাস গ্রহণ করলো, তখন আবার তাদের মধ্যে অশুভ বিদ্রোহী স্বভাব ও ঘৃণ্য মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। মিসরের তীহ্ প্রান্তরে দীর্ঘ ৪০ বছর তারা উদভ্রান্তের মতো জীবন-যাপন করলো, এ অবস্থাতেও হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের দোয়ার বরকতে তারা খাদ্য ও প্রখর সূর্যকিরণ থেকে মুক্ত ছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহর এই নে'মাত ও হযরত মূসার কঠোর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তারা পুনরায় জঘন্য কর্ম তৎপরতায় লিপ্ত হলো। আল্লাহ্ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত মূসা তাদেরই আবাস ভূমি সিরিয়া পুনর্দখলের জন্য যখন তাদেরকে জিহাদের দিকে আহ্বান জানালেন, তখন তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে আল্লাহর নবীকে জানিয়ে দিলো, 'তুমি আর তোমার আল্লাহ্ গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা পারবো না।'

চরম গর্হিত কর্মে লিপ্ত হওয়া ও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্যন্ত ইয়াহূদী জাতি অভিশাপের বোঝা বহন করে বেড়াবে। তাদের অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধ প্রবণতার কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। পবিত্র কোরআনে সূরা তওবায় মহান আল্লাহ ঘোষনা করেছেন, তাঁর শাস্তি প্রদানের একটি নিয়ম হলো, তিনি কোনো অবাধ্য জাতিকে শায়েস্তা করেন আরেকটি পরাক্রমশালী জাতিকে দিয়ে। পাপাচারে

লিপ্ত অবাধ্য জাতিকে পরাক্রমশালী জাতির গোলামে পরিণত করে দেন। এই ধরণের শাস্তি অবাধ্য ইয়াহূদী জাতির ওপরে বারবার এসেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা শান্তিতে নেই। সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত তাদেরকে সজাগ-সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে এবং পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী কোথাও তারা স্বাধীনভাবে শান্তি ও স্বস্তির জীবন-যাপন করতে পারবে না।

ইতিহাসে দেখা যায় এই ইয়াহূদী জাতির অবাধ্যতা, সন্ত্রাসী তৎপরতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধের কারণে তাদের ওপরে বিভিন্ন জাতি বারবার আক্রমণ চালিয়ে ঘর-বাড়ি ছাড়া করেছে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, তাদের সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেছে। আশুরীয় বাদশাহ পিয়ার খৃষ্টপূর্ব ৭২৪ সালে ইসরাঈল রাজ্য আক্রমণ করে হাজার হাজার ইয়াহূদীকে হত্যা করে। কয়েক হাজার ইয়াহূদীকে রশি দিয়ে বেঁধে নিজের দেশে নিয়ে দাসে পরিণত করে। খৃষ্টপূর্ব ৫৬১ সালে ব্যাবিলনের শাসক বখত নেছার যেরুজালেম আক্রমণ করে গোটা শহর ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। তারপর ৭০ হাজার ইয়াহূদীকে বন্দী করে নিজের দেশে নিয়ে দাসে পরিণত করে। রোমান শাসকবৃন্দ ঈসায়ী ৭০ সালে ইয়াহূদী রাষ্ট্র আক্রমণ করে হাজার হাজার ইয়াহূদীকে তীর, তরবারী, বর্শা ইত্যাদী দিয়ে হত্যা করে। সে সময়ে ইয়াহূদী রাজ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। রোমানগণ পুনরায় ১৩২ সালে ফিলিস্তিন আক্রমণ করে হাজার হাজার ইয়াহূদীকে হত্যা করে, সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে এবং তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়।

একাধিক বার ভিন্ন জাতির আক্রমণের ফলে, রোমানদের নির্যাতনে টিকতে না পেরে ইয়াহূদী জাতি পৃথিবীর দেশে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তারা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের দেশ বলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পৃথিবীর যেখানেই তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেখানেই তারা আশ্রয়দাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে সর্বত্রই তাদের ওপর নেমে এসেছে তাদের অশুভ কর্মের পরিণাম।

লোভের যতগুলো মানদন্ড আছে সমস্ত মানদন্ডেই উত্তীর্ণ হবে ইয়াহূদী জাতি। এদের অর্থ লোভ এতই প্রবল যে, ঘৃণ্য সূদ বৈধ করার জন্য তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করে হারাম সূদকে হালাল বানিয়েছে। সূদী ব্যবসায় তাদের কলংক গোটা বিশ্ব জোড়া। অপরের অর্থ নিজের পকেটস্থ করার বৈধ-অবৈধ কলা-কৌশল তারা প্রয়োগ করে। এই জাতির রক্তে মিশ্রিত রয়েছে নিষ্ঠুরতা, লোভ, অমানবিকতা, হিংস্রতা,

বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। এসব কারণে পৃথিবীতে এরা কোথাও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারেনি। সর্বত্রই তাদের প্রতি ঘৃণাভরে থু-থু নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিতাড়িত হতে হয়েছে অথবা নির্মমভাবে নিহত হতে হয়েছে। বর্তমানের ইয়াহূদী রাষ্ট্রের প্রতি মুসলিম নামধারী শাসকদের মধ্যে যারা আমেরিকার লেজুর বৃত্তি করে, তারা সমর্থন দিতে বাধ্য হলেও সারা পৃথিবীর সাধারণ মুসলিম জনতা তাদেরকে ঘৃণা করে।

ইংল্যান্ড থেকে ১২৯০ সালে ইয়াহূদীদেরকে বিতাড়িত করা হয়। ফ্রান্স প্রথমে ১৩০৬ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। পুনরায় ১৩৯৪ সালে ফ্রান্স থেকে আবার তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। বেলজিয়াম ১৩৭০ সালে ইয়াহূদীদেরকে বিতাড়িত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া ১৩৮০ সালে তাদেরকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। হল্যান্ড ১৪৪৪ সালে তাদেরকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। ইটালী ১৫৪০ সালে তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। জার্মানী ১৫৫১ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। রাশিয়া ১৫১০ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার পাইকারীভাবে ইয়াহূদীদেরকে হত্যা করে। এভাবে হত্যা, লাঞ্ছনা-অপমান, বিতাড়ন ও নির্বাসন ইত্যাদী দুর্ভোগের কাহিনীতে এই জাতির ইতিহাস কলংকিত। বিশ্বাসঘাতক এই ইয়াহূদী জাতির সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মদীনা থেকে ইয়াহূদী জাতিকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরাই সেই সন্ত্রাসী জাতি, যারা মদীনা মনোয়ারায় রওজা মোবারক থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেহ মোবারক চুরি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে ধরা পড়ে মৃত্যুদন্ড ভোগ করেছিলো।

ইয়াহূদীদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের ধন-সম্পদের ওপরে মালিকানা থাকবে না। পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ইয়াহূদীরা। ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য যে কোনো মানুষের ধন-সম্পদ ইয়াহূদীরা দখল করতে পারবে। ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য সকল মানুষের ধন-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্যই খোদা তা'য়ালা ইয়াহূদীদের দুনিয়ায় মনোনীত করেছেন। ইয়াহূদীরাই সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য সকল মানুষের মধ্যে পাপবোধ রয়েছে। খোদা তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য সকল মানুষকে সুদ ব্যতীত অর্থ ঋণ না দিতে, অর্থ ঋণ দিলে অবশ্যই সুদ আদায় করতে হবে।'

যাদের ধর্মগ্রন্থ এ ধরনের কদর্য শিক্ষা দেয়, তাদের স্বভাব-চরিত্র কতটা নোংরামীতে

নিমজ্জিত হতে পারে এবং কোন্ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব

ইয়াহূদীদের সমর্থক পাপাচারে লিপ্ত খৃষ্টশক্তির সহযোগিতা ব্যতীত তারা এক মূহূর্ত টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে কোথাও তারা নিজেদের শক্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না। চিরকাল তারা অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, 'ইয়াহূদীরা তো রীতি মতো মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ওপরে হুমকির ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে প্রতিদিন পাখির মতো গুলী করে হত্যা করছে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন, পৃথিবীর কোথাও এরা স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে পারবে না!'

এই ইয়াহূদীরা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসনমুখী মুসলিম বিদ্বেষী রাষ্ট্রসমূহ ষড়যন্ত্র করে ইয়াহূদীদেরকে ফিলিস্তীনে একত্রিত করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বজায় রাখার লক্ষ্যে আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেন এবং তাদের সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ এই ঘৃণ্য কাজটি সম্পাদন করে। এসব রাষ্ট্র ইসরাঈলের যে কোনো মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতি বিশ্ব-জনমতের তোয়াক্কা না করে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াহূদীরা তাদের নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করারও সমর্থ রাখে না। ওদের ওপর থেকে পশ্চিমা বিশ্ব সমর্থন প্রত্যাহার করার সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহূদীদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং ইসরাঈলী রাষ্ট্র ইয়াহূদীদের কোনো জাতীয় স্বাতন্ত্রের অভিব্যক্তি নয়। এটা পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিম বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের অবৈধ ফসল। ইয়াহূদীদের রাষ্ট্র কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। পবিত্র কোরআনে সূরা ইমরানের ১১২ আয়াতে এ কথাও আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় বা কোনো মানুষের সাহায্যে ইয়াহূদীরা কোথাও প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সাময়িক এবং সেখানেও তারা শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না। সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে, অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে ভিক্ষুকের মতো অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন-যাপন করবে।

ইয়াহূদীদের নিজস্ব কোনো দেশ নেই, নিজের মতো স্বাধীনভাবে বসবাস করার

মতো নেই কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাদের অখন্ডনীয় অভিশাপ, তারা চিরকালই গৃহহীন– শুধু গৃহহীনই নয়, যাযাবরদের মতো দেশে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে কিন্তু কোথাও কখনো তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদাও পায়নি। নানা ধরনের জঘন্য পন্থায় তারা বেশ অর্থের মালিক হয়েছে, কিন্তু তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যথাসময়ে এমন নৃশংসভাবে নিহত ও বিতাড়িত হয়েছে, যা এক বিভৎস লোমহর্ষক ইতিহাস। এত ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও ভয়াবহ পরিণতি পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ললাটে জোটেনি।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা ও কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অনেকে বলে থাকে যে, ইয়াহূদীরা তো ইসরাঈল নামক একটি সুদৃঢ় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা মারণাস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তুলেছে সে দেশটি জাতিসংঘের সদস্য পদও অর্জন করেছে। তারা সাহসী যোদ্ধা, প্রবল প্রতিপক্ষকে তারা পরাস্ত করতে সক্ষম। বিশ্বাসঘাতক-সন্ত্রাসী ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত এবং তারা কখনো স্বাধীন ভূখন্ডের মালিক হয়ে শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না– কোরআনের এই ঘোষণা বাস্তবতার বিপরীত। বিগত কয়েক শতাব্দীর কণ্ঠলগ্ন চরম অভিশাপ থেকে তারা মুক্তি লাভ করেছে এবং তারা বর্তমানে এতটাই স্বাধীনতা অর্জন করেছে যে, ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রটি ক্ষুদ্র থেকে ক্রমশ বৃহত্তর হচ্ছে এবং প্রতাপশালী এই রাষ্ট্রের সীমানা ও জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেক ইয়াহূদী বর্তমানে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের গর্বিত নাগরিক। সারা পৃথিবীর অর্থনীতি, রাজনীতি, সংবাদ মাধ্যম তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। এমনকি বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকার মতো দেশের ক্ষমতার পালাবদলের চাবিকাঠিও তাদেরই হাতে।

বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত বিষয় অবশ্যই সত্য এবং এই বাস্তবতা বর্তমানে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞায় ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের মধ্যে ব্যাপক গুরুতর অসংগতি বিদ্যমান। এ কথা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য মুসলিম বিদ্বেষী রাষ্ট্রের গোপন মিলনাভিসার থেকে ভূমিষ্ঠ ইয়াহূদী রাষ্ট্রের নৈতিক ও ভৌগলিক অস্তিত্ব অত্যন্ত ভঙ্গুর-দুর্বল। অবৈধ এই রাষ্ট্রটি এতটাই দুর্বল যে, আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্রসমূহের প্রণয়দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ামাত্র মুহূর্তকালের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

সুতরাং ইয়াহূদী জাতি অভিশাপমুক্ত হয়নি, বরং অভিশাপের বোঝা আরো অধিক

দুর্বহ হয়ে চেপে বসেছে এবং অভিশাপের কৃষ্ণকালো প্রলঙ্করী ঘূর্ণি সৃষ্টিকারী মেঘ ইয়াহূদী জাতিকে পরিবেষ্টিত করেছে। ইয়াহূদীদের প্রাণের স্পন্দন তাদের বুকে নয়, তাদের প্রাণ স্পন্দন স্পন্দিত হচ্ছে আমেরিকার কৃপায় ওয়াশিংটনস্থ অফিসে অযত্নে রক্ষিত বিশেষ এক ফাইলে। এই ফাইলে আমেরিকা নিজেদের স্বার্থে ঘৃণাভরে আঙ্গুলের টোকা দেয় বলেই ইয়াহূদীদের বুকে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, আমেরিকা যখন এই ফাইলটি ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করবে, তখন ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের বুকে আর প্রাণের স্পন্দন শোনা যাবে না।

সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবগত রয়েছেন যে, ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রকৃত অর্থে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়– বরং রাষ্ট্রের নামে এটি আমেরিকার একটি ভাঁড়ার ঘর ও ভাগাড় মাত্র। ইসরাঈল মানেই আমেরিকার জন্য অবাঞ্ছিত এক গলগ্রহ ঘৃণিত বোঝা। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই যে স্বাধীন রাষ্ট্র নয় এবং ইয়াহূদীরা যে স্বাধীন নাগরিক নয়, তা সারা পৃথিবীবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিগত পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে। ইরাক কুয়েত দখল করার পরে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা সাবেক প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ ইরাকের ওপর হামলা করলো, তখন ইরাক আত্মরক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের ওপর নিক্ষেপ করেছিলো।

কিন্তু পরাধীন ক্রীতদাস ইসরাঈলের পক্ষে আমেরিকার অনুমতি ব্যতীত এক রাউন্ড গাদা বন্দুকের গুলীও ইরাকের দিকে ছুড়তে পারেনি। ইসরাঈল যেনো ইরাকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, এ জন্য আমেরিকা ইসরাঈলকে আত্মরক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম সেন্টিমেন্টের কথা বিবেচনা করে ইসরাঈলকে নীরবে-নিঃশব্দে স্কাডের আঘাত হজম করার নির্দেশ দিলো। পরাধীন ইসরাঈলও নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে ক্রীতদাসের মতো বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে, অবনত মস্তকে আমেরিকার আদেশ পালন করলো।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় উক্ত ঘটনা থেকে সচেতন মহল স্পষ্ট বুঝে নিলো, ইসরাঈল প্রকৃত অর্থে আমেরিকারই একটি দূরবর্তী অঙ্গরাজ্য মাত্র। পার্থক্য শুধু এখানে যে, ইসরাঈল নামক এই অঙ্গরাজ্যটিকে আমেরিকা স্বাধীনতার ছদ্ম পোষাকে সজ্জিত করে জীবন-মৃত্যুর কঠিন ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করে যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছে সে নিজে। যাবতীয় কষ্ট সহ্য করছে ইসরাঈল, বিশ্বব্যাপী নিন্দার তিলক পরছে সে, শান্তি প্রিয় মানুষের ঘৃণার লক্ষ্য স্থলে পরিণত হয়েছে সে, আর আমেরিকা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে ফায়দা আত্মসাৎ করছে। এই ফায়দার কারণেই আমেরিকা কখনো ইসরাঈলের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরোধিতা করে না।

আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণে ইসরাঈল বিশ্বস্ত ভৃত্যের দায়িত্ব পালনে ক্রটি করলেই প্রভু-ভৃত্যের এই মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরবে। এই ফাটল দৃশ্যমান হবার সাথে সাথেই ইসরাঈলের অস্তিত্বও অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করবে।

কেউ কেউ আবার মন্তব্য করে থাকেন যে, ইসরাঈলের জনসংখ্যা ও ভৌগলিক পরিধি যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেনো, আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাঈল মারণাস্ত্রের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তুলেছে, প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করেছে এক চৌকস সেনাবাহিনী। সুতরাং সেদিন বেশী দূরে নয় যে, ইসরাঈল নামক ইয়াহূদী রাষ্ট্রটি আমেরিকার দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

উল্লেখিত মন্তব্য যারা করেন, তারা এ কথা ভুলে যান যে, আমেরিকা ও ইসরাঈল এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য স্বার্থবন্ধনে আপাতত বন্দী এবং স্বার্থের কারণেই তাদের প্রণয় আরো কিছুদিন অটুট রাখা প্রয়োজন। ইয়াহূদীদের বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদ মাধ্যম, বিশাল ধনভান্ডার ও অন্যান্য সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আমেরিকাই নানা কৌশলে ব্যবহার করছে। তেলসমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বুকের ওপর আমেরিকার যে একজন অতি বিশ্বস্ত প্রহরী মোতায়েন রাখা একান্ত প্রয়োজন, ক্রীতদাস ইসরাঈল সে কাজটিও পরম আনুগত্যের সাথে পালন করে যাচ্ছে। অপরদিকে ইয়াহূদীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে তারাও বাধ্য হয়ে খৃষ্টান আমেরিকার সাথে প্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছে। কারণ চারদিক থেকে মুসলিম রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের পেছন থেকে যদি আমেরিকা গোস্বা করে সরে যায়, তাহলে তাদের পরিণতি যে কত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, এ কথা তারা কল্পনা করেও নিদ্রার ঘোরে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

সুতরাং আমেরিকার সাথে ইসরাঈলের পক্ষে আনুগত্য পরায়ন ক্রীতদাসের অনুরূপ আচরণ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ বর্তমানে খোলা নেই। আমেরিকা ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখে যে কোনো বিশেষজ্ঞ কূটনীতিবিদই এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলবেন যে, এ দুটো দেশ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে ব্যবহার করছে। এই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা খুব দ্রতই শেষ হয়ে আসছে এবং ইসরাঈল ক্রমশ চরম এক ঝুঁকির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর কারণ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতোই স্বার্থান্ধ ও শক্তিশালীই হোক না কোনো এবং জাতিসংঘকে সে যতোই আনুগত্য পরায়ণ ভৃত্যে পরিণত করুক না কোনো, ইসরাঈলের সকল সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সমর্থন দিতে গিয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান ও ভাবমর্যাদা মারত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থান ও ভাবমর্যাদা পুনরায় উদ্ধার করা ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপায় নেই।

ইসরাঈলের ব্যাপারে আমেরিকার জনগণের দৃষ্টি পূর্বে ঝাপসা থাকলেও বর্তমানে প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিমুখী, দ্বৈত মানদন্ড ও পক্ষপাতমূলক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে বছরের পর বছর ইসরাঈলের যাবতীয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমর্থন দিয়ে যাবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। স্বাধীনচেতা জনগণের চাপেই ইয়াহূদীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করতে আমেরিকা বাধ্য হবে এটা অবধারিত। এ বিষয়টি প্রত্যেক ইয়াহূদীও খুব ভালো করেই জানে এবং এ কারণেই তারা চরম এক উদ্বেগের মধ্যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত অবস্থান করছে। ঠিক এ কারণেই তারা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চুক্তির জন্য আমেরিকার কাছে বারবার ধর্ণা দিচ্ছে। আর আমেরিকাও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ও মিশরের সাথে ইসরাঈলকে জুড়ে দিয়ে কথিত শান্তিচুক্তি কার্যকর করার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করছে।

নতুন মিত্রের সন্ধানে সন্ত্রাসী জাতি

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান জাতি পরস্পর কখনো পরস্পরের বন্ধু ছিলো না। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছে যে, তারতালানুস নামক এক ইয়াহূদীই হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য উৎসাহভরে অগ্রসর হয়েছিলো। ইয়াহূদীরা সুযোগ বুঝে যেমন খৃষ্টানদের ওপর নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে অগণিত খৃষ্টান হত্যা করেছে, অনুরূপভাবে খৃষ্টানরাও ইয়াহূদীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছে। খৃষ্টানরা যে যিশুখৃষ্টকে গড-এর পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করে, ইয়াহূদীরা তাকে 'জারজ' সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে। এরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ এবং একে অপরের কঠিন দুশমন। ইসলাম ও মুসলমানদের কেন্দ্র করে এই পরস্পর বিরোধী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর প্রণয় দেখা গেলেও এদের অবস্থা পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ-تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَّ قُلُوبُهُمْ شَتّٰى-

তাদের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা খুবই মারাত্মক, তুমি তো এদের মনে করো এরা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু (মোটেও তা নয়,) এদের অন্তর হচ্ছে শতধা বিচ্ছিন্ন। (সূরা আল হাশর-১৪)

পৃথিবীর মানুষ ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল ও খৃষ্টান রাষ্ট্র আমেরিকাসহ অন্যদেরকে এক অবস্থানে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মন-মানসিকতায় শত যোজন ব্যবধান রয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই এরা স্বমূর্তি ধারণ করে পরস্পরের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইয়াহূদী ইসরাঈল নিজেদের অতিত ইতিহাস সম্মুখে খোলা

রেখেই ভবিষ্যৎ দিনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে অতিতে এদের সম্পর্ক কারো সাথেই স্থায়ী হয়নি এবং আমেরিকার সাথেও হবে না, এ কথা ইয়াহূদীরা মাথায় রেখে আমেরিকার সাথে বাহ্যিক সম্পর্কের বন্ধন অটুট রেখেই দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য বন্ধুর সাথে গভীর প্রণয় গড়ে তুলেছে।

ইয়াহূদীদের বিশ্বস্ত বন্ধু কে- এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সর্বপ্রথম আমাদের জানা প্রয়োজন মুসলমানদের কঠিন দুশমন কারা। তাহলেই ইয়াহূদীদের পরম বন্ধুর অবস্থান চিহ্নিত করা যাবে। মুসলমানদের কঠিন দুশমনদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন-

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا-وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوا اِنَّا نَصٰرٰى-

অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরই বেশী কঠোর দেখতে পাবে, অপরদিকে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে কিছুটা নিকটতর পাবে, যারা বলেছে আমরা খৃষ্টান। (সূরা আল মায়িদা-৮২)

খৃষ্টানরা অহী অবতীর্ণের ধারায় বিশ্বাসী এবং পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সেই লোকদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে, যারা ধর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে যতোই ভিন্ন মত পোষণ করুক না কেনো, কিন্তু মূলত তারা তাদেরই মতো আল্লাহ ও অহীর অবতরণধারাকে মেনে চলে। কিন্তু ইয়াহূদীরা হচ্ছে এক অদ্ভুত ধরনের আহলি কিতাব দাবিদার সম্প্রদায়। আল্লাহর একত্ববাদ-তাওহীদ ও বহুত্ববাদ তথা শিরকের পারস্পরিক যুদ্ধে ইয়াহূদীরা প্রকাশ্যে পৌত্তলিক তথা মুশরিকদের সমর্থন ও সাহায্য করেছে এবং আগামীতেও করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের ব্যাপারে তারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে এক জোট হয়েছিলো। এরপরেও এই ইয়াহূদীরা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বলে থাকে যে আমরা আহলি কিতাব তথা আমরা আল্লাহ্, নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব মেনে চলি।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মুসলমানদের প্রাণের কঠিন দুশমন হলো ইয়াহূদী ও মুশরিক সম্প্রদায়। অতিত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাও এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এই দুটি সম্প্রদায়ের কারণেই মুসলমানরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। এই মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কারণেই ভারতে দীর্ঘ ৮ শত বছরের মুসলিম শাসনের সমাপ্তি ঘটেছে এবং বাংলার স্বাধীনতা সূর্য দীর্ঘ ২ শত বছরের জন্য অস্তমিত হয়েছিলো। এদেরই ষড়যন্ত্রের কারণে দেশে দেশে মুসলমানরা একে অপরকে হত্যা করেছে।

খৃষ্টানদের ব্যাপারে ইয়াহূদীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ কারণেই তারা অত্যন্ত গোপনে পৌত্তলিক ভারতের সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে সামরিক চুক্তিসহ নানা ধরনের গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ইসরাঈল আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘে ভারত যেনো ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, এ ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যে হলো, ভারতকে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর ওপর লাঠিয়াল বানানো। ধর্মীয় বিধানের দিক থেকেও ইয়াহূদীদের সাথে পৌত্তলিকদের অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে এবং এ দুটো ধর্মই হলো গোত্রীয় ধর্ম। ইয়াহূদী এবং পৌত্তলিক তথা মুশরিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষে ধর্ম পরিবর্তন করে ইয়াহূদী বা পৌত্তলিক ধর্মভূক্ত হবার কোনো পথ খোলা নেই। এ কারণেই এরা পৃথিবীর অন্য মানুষকে নিজেদের মধ্যে গণ্য করতে পারে না।

সন্ত্রাসী জাতির ঘৃণ্য কৌশল

নিজেদের অপকর্মের কারণে পৃথিবীতে অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত ও বিভিন্ন দেশ থেকে বারবার বিতাড়িত হয়ে ইয়াহূদীরা প্রতিশোধ স্পৃহায় নানা ধরনের সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। এসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ল্ড জায়নিষ্ট অরগানাইজেশন, ফ্রীম্যাসন, হেগনা, ইরগুন, জীউইস এজেন্সী, কাহাল, জামেয়া ইয়াহূদীয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও নামে-বেনামে নানা ধরনের ইয়াহূদী সংগঠন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে সক্রিয় রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আরো অধিক সংগঠন সৃষ্টি করা হচ্ছে। কতক সংগঠনের নাম এবং বাহ্যিক কার্যক্রম দেখলে মনে হবে এর সাথে ইয়াহূদীদের কোনোই সম্পর্ক নেই। যেমন মুসলিম, খৃষ্টান বা হিন্দু প্রধান দেশে সংশ্লিষ্ট দেশ ও ধর্মের খেদমতেই এসব সংগঠন কাজ করছে এবং এর সাথে যারা জড়িত, তারা সকলেই স্ব-স্ব ধর্মের অনুসারী। প্রকৃতপক্ষে এসব সংগঠনের মূল স্রষ্টা ইয়াহূদী এবং এদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই তারা কাজ করছে।

ইয়াহূদীরা এসব সংগঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক স্রোতধারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে প্রবাহিত করে থাকে। বিভিন্ন নামে ব্যাংক, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচার মাধ্যমসমূহ নিজ স্বার্থের অনুকূলে রাখে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ইয়াহূদী স্বার্থের সমর্থক তৈরী করে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেক বিভাগে নিজেদের লোক তৈরী করে প্রয়োজন অনুযায়ী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো বা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে থাকে। নানা ধরনের এনজিও প্রতিষ্ঠিত করে সেবাধর্মী কাজের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে। যেমন বাংলাদেশে একটি বিশাল এনজিও প্রকাশ্যে

ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সমর্থক এবং এরা প্রয়োজনে ধর্মনিরপেক্ষ দলটিকে যেমন অর্থ সাহায্য দেয় তেমনি তাদের সভা সমাবেশে লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে থাকে।

এভাবে প্রত্যেকটি দেশের বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক অঙ্গন, শিক্ষাঙ্গন, শ্রমিক অঙ্গন, ধর্মীয় অঙ্গন, আইন-আদালত তথা বিচার বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যেকটি বিভাগে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে নিজেদের মতাবলম্বী সৃষ্টি করে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থে ইয়াহূদীরা ব্যবহার করছে। ইয়াহূদীদের এসব সংগঠন প্রত্যেক দেশে সরকারের মধ্যে আরেকটি গোপন সরকার কায়েম করে দেশে নানা ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি করে থাকে। নিজেদের স্বার্থে কোনো আঘাত এলেই এরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে, শ্রমিক বা রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি, শিক্ষাঙ্গন বা পরিবহন সেক্টরে অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশকে প্রায় অচল করে দেয়ার ব্যবস্থা করে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে জীবিত থাকাবস্থায় এরা মুসলিম দুনিয়ার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। কারণ এদের অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। ওহীর ধারা চিরতরে বন্ধ হবার সাথে সাথে এই সন্ত্রাসী ইয়াহূদী গোষ্ঠী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করতে থাকে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে ইসলামের নামে নানা ধরনের পথ ও মত এরাই সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করেছে এবং পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি হিংস্র করে তুলে রক্তাক্ত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ইসলামের তিনজন সম্মানিত খলীফার হত্যাকান্ড, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সিফ্ফীনের যুদ্ধ, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা এবং মুসলমানদের মধ্যে শীয়া, সুন্নী, মুতাযিলা-খারেজীসহ নানা ধরনের উপদল এদেরই সৃষ্টি এবং এসব ঘটনাবলীর পেছনে ইয়াহূদীদের সন্ত্রাসী হাত সক্রিয় ছিলো।

বর্তমান পৃথিবীতে নানা ধরনের মতবাদ-মতাদর্শের জন্ম ইয়াহূদীরাই দিয়েছে। ঘৃণ্য পূঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এদের গর্ভের ফসল। একটি মতবাদ আবিষ্কার করে মানুষকে তার অনুসারী বানালে পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকে না। কারণ, প্রতিপক্ষই যদি না থাকে তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হবে কার সাথে! এই পরিস্থিতি সন্ত্রাসী ইয়াহূদীদের কাম্য নয় বিধায় তারা পরস্পর বিপরীতমুখী কয়েকটি মতবাদ, মতাদর্শ ও চিন্তাধারা সৃষ্টি করে থাকে। যেনো এসব চিন্তাধারার অনুসারীরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রম ও মেধা ব্যয় করার কাজে নিয়োজিত থাকে, আর এরই মধ্যে তারা ঘোলাপানিতে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। একই সাথে গোপনে দুটো দেশের সাথে

ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এরপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশ দুটোর মধ্যে সুসম্পর্ক বিনষ্ট করে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে উভয়ের কাছে অস্ত্র ও নানা ধরনের প্রযুক্তি বিক্রি করা এবং নানা শর্তে চড়া সুদে অর্থ ধার দেয়া এদের ঘৃণ্য পেশা।

মারণাস্ত্র ও নানা মতবাদের সৃষ্টি

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইয়াহূদীরা ইসলামের তিনজন সম্মানিত খলীফাকে হত্যা ও কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটিয়ে ক্রমশ মুসলমানদেরকে ইসলামের গন্ডী থেকে সরিয়ে আনতে থাকে। এরপর রাজা-বাদশাহদের শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করে এক পর্যায়ে মুসলমানদের মনে আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কিত ধারালো চেতনাকে ক্রমশ ভোঁতা চেতনায় পরিণত করে।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম-ওলামাদের সমাজে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত করে। সাধারণ মুসলমান ও অধিকাংশ নেতৃত্বের মধ্যে এমন নির্লিপ্ত মনোভাব এরা সৃষ্টি করে যে, শাসক গোষ্ঠী ইয়াহূদী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশ্যে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত কাজ করছে দেখেও কেউ-ই তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। শাসক গোষ্ঠীকে ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত ও চরিত্রহীনতার পথে ঠেলে দিয়ে, চিত্ত বিনোদনের নামে আনন্দ-ফূর্তির নানা মাধ্যম আবিষ্কার করে সাধারণ মানুষকে এর মধ্যে মাতোয়ারা রেখে এরপর দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থির সৃষ্টি করে ইয়াহূদীরা। তারপর নিজেরাই পরামর্শদাতা সেজে শাসকগোষ্ঠীকে তাদেরই আবিষ্কৃত ফর্মূলা গ্রহণ ও দেশের বুকে প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। এসব প্রক্রিয়া একদিনে সম্পন্ন হয়নি, শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধনা করে ইয়াহূদীরা এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

ইসলামের উত্থান রোধ করার জন্য এরা প্রথমে আবিষ্কার করলো পুঁজিবাদ। পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে ঐ মতবাদের অনুসারী ও সমর্থকও সৃষ্টি করলো। কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী সকল মানুষ একই ব্যবস্থার অধীনে থাকলে তো গোলযোগ সৃষ্টি হবে না এবং তাদের অশুভ উদ্দেশ্যও সফল হবে না। অতএব পুঁজিবাদের মোকাবেলায় সৃষ্টি করা হলো আরেকটি চরমপন্থী মতবাদ সমাজতন্ত্র। কমুনিষ্ট আন্দোলনের মূলে যেসব লোকদের চিন্তাধারা সক্রিয় ছিলো তারা সকলেই ইয়াহূদী। সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা কার্লমার্কস পিতামাতা উভয় দিক দিয়েই ছিলেন ইয়াহূদী। লেলিন, ট্রটস্কি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং তাদের স্ত্রীগণ সকলেই ছিলেন ইয়াহূদী সন্তান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে পলাতক লেলিন তার ২ শত সাথীসহ গোপনে ট্রেনে জার্মান থেকে রাশিয়ায় প্রবেশ করে। তার সাথীদের মধ্যে ১২৬ জনই ছিলো ইয়াহূদী। লেলিন রাশিয়ায় প্রবেশ করার পরপরই ট্রটস্কিও ৩ শত ইয়াহূদীকে সাথে নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করেন।

ইয়াহূদীরাই রাশিয়ায় বসে জার সরকারকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ করেছিলো। তারা সেখানে এমন সন্ত্রাসের তান্ডব সৃষ্টি করেছিলো যে, জার পরিবারের একটি শিশুকেও জীবিত রাখেনি এবং বাড়ির পোষা কুকুরগুলোকেও হত্যা করেছিলো। এরপর রাশিয়ার শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে ইয়াহূদীরা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে আমেরিকার পূজিবাদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার নাটক শুরু করে। আমেরিকার শাসনযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ইয়াহূদীদের পরামর্শে শাসকগোষ্ঠীও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকে। শুরু হয়ে যায় স্নায়ুযুদ্ধ। ইয়াহূদীরা এই নাটক সৃষ্টি করে শুরু করে নিত্য-নতুন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবসা।

আমেরিকার বলয়ভুক্ত দেশগুলোও অস্ত্র ক্রয় করতে থাকে, অপরদিকে রাশিয়ার বলয়ভুক্ত দেশগুলোও অস্ত্র ক্রয় করতে থাকে। মদ, গান-বাজনা, নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় খেলা-ধূলা, মানুষকে বিমোহিত ও আচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টিকারী উপাদান ইয়াহূদীদেরই আবিষ্কার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতিকে ক্রমশ এসব উপদানের প্রতি আকৃষ্ট করে তারপর শুরু করে উক্ত উপাদানের ব্যবসা। আর এসব ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনেই তারা বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, প্রতিরক্ষানীতি এবং অন্যান্য দিক ও বিভাগে নিজেদের লোক সৃষ্টি করেছে।

যেমন বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে যে ভয়াবহ বোমাবাজির সৃষ্টি হয়েছে, এ বিষয়টি এই গরীব দেশের অর্থনীতির ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। যেসব সেক্টরে পূর্বে অর্থ ব্যায়ের কোনোই প্রয়োজন ছিলো না, সরকার বর্তমানে বাধ্য হয়েই সেসব খাতে অর্থ ব্যয় করছে। নিরাপত্তার সাথে যুক্ত যেসব সামগ্রী ইতোপূর্বে এ দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি এবং প্রয়োজনও ছিলো না, সেসব সামগ্রী আমদানী করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে এই অবস্থা সৃষ্টি করে যেমন অর্থনৈতিকভাবে এদেশকে ইয়াহূদী পরিচালিত 'বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থার' করুণাপ্রার্থী বানানো হচ্ছে সেই সাথে ইয়াহূদী বা তাদের প্রভাবান্বিত সংস্থা কর্তৃক আবিষ্কৃত ও নির্মিত নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে ইয়াহূদীরা এমন এক বলয় সৃষ্টি করেছে যে, এর বাইরে স্বাধীনভাবে কোনো জাতি নিজেদের যাবতীয় কিছু পরিচালনা করবে, সে ব্যবস্থার পথে এরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তৎপর রয়েছে।

ভয়াবহ আনবিক বোমার জনকও ইয়াহূদী সন্তান মিঃ জে রবার্ট ওপেনহাইমার নামক এক ব্যক্তি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফসল এবং এই যুদ্ধে তারা

আমেরিকাকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। তাদেরই আবিষ্কৃত আনবিক বোমা আমেরিকা নিক্ষেপ করে ১৯৪৫ সালে ৬ই আগষ্ট জাপানের শিল্প শহর হিরোশিমায় এবং ৯ই আগষ্ট নাগাসাকিতে। যে বৈমানিক বোমা নিক্ষেপ করেছিলো, তার ধারণাও ছিলো না বোমার ধ্বংস ক্ষমতা সম্পর্কে। বোমা নিক্ষেপ করার পরে নিচের দিকে তাকিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ দেখে উক্ত বৈমানিক ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলো এবং পরবর্তীতে সে যুদ্ধ করার উৎসাহই হারিয়ে ফেলেছিলো। ইয়াহূদী আবিষ্কৃত বোমায় যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বাতাসের মিশে গিয়েছে, মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিষ্ঠুর ট্রুম্যান আনন্দে আত্মহারা হয়ে আনবিক বোমার আবিষ্কারক ইয়াহূদী মিঃ জে রবার্ট ওপেনহাইমারকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলেছিলে, 'আপনি আমার কাছে কি চান!'

সন্ত্রাসী ঘাতক ওপেনহাইমার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের চোখে চোখ রেখে আবেদন করেছিলো, আমার ইয়াহূদী জাতির জন্য ছোট্ট একখন্ড ভূমি।' পূর্ব থেকেই যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করাই ছিলো, এবার আমেরিকা ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর হিংস্র দন্ত-নখর বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলমানদের বিতাড়িত করে সারা পৃথিবী থেকে ইয়াহূদী এনে ফিলিস্তিনে জড় করা হলো। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইয়াহূদী নেতা বিন গুরিয়ান রাত ১২টা ১ মিনিটে যখন মুসলমানদের বুকের ওপর স্বাধীন ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলো, তখন এর মাত্র ১০ মিনিট পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিলো। ইয়াহূদী কর্তৃক পরিচালিত রাশিয়াও স্বীকৃতি দিলো এবং ইয়াহূদী প্রভাবিত অন্যান্য সকল অমুসলিম দেশ স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ব সন্ত্রাসের জনক ইসরাঈলকে বৈধ করলো। এই ইয়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে এবং এখন পর্যন্ত কত লক্ষ্য মুসলমান যে ইয়াহূদীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে, এর হিসাব বোধহয় ইয়াহূদী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদও দিতে পারবে না।

সমাজতন্ত্রের পতন ও সন্ত্রাসীদের নতুন কৌশল

ইয়াহূদীরা স্বয়ং বা খৃষ্টান ও মুশরিকদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পর্দার আড়াল থেকে পৃথিবীর দেশে দেশে নানা সঙ্কট সৃষ্টি করে এবং ত্রাণকর্তার ভূমিকায়ও তারাই অবতীর্ণ হয়। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার জন্যই ইয়াহূদী ও মুশরিকদের এত আয়োজন এবং এ কাজে তারা অন্যান্য অমুসলিমদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে। শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) ও ইরানের ইমাম

খোমেনী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এক সময় মন্তব্য করেছিলেন, এই মতবাদটি এক সময় নিজ ঘরে আত্মহত্যা করে স্থান করে নেবে যাদুঘরে। রাশিয়ায় গর্বাচেভের শাসনামলে হলোও তাই।

অপরদিকে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভারতীয় উপমহাদেশে আল্লামা মওদুদী (রাহঃ) জামায়াতে ইসলামী ও মিশরসহ আরব দুনিয়ায় ইমাম হাসান আল বান্না (রাহঃ) ইখওয়ানুল মুসলিমীন নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ঝড়ের বেগে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিপ্লবী দাওয়াত ছড়িয়ে দিলেন। এ দুটো অপ্রতিরোধ্য কাফেলা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের দুয়ারে পৌঁছে গেলো। সারা দুনিয়ায় অশান্তির আগুন জ্বলছে, মানুষ শান্তির আশায় দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, তখনই এ দুটো সংগঠন শান্তি পিয়াসী মানুষের মনে আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করলো এবং মুসলিম-অমুসলিম সুধিবৃন্দ এই আন্দোলনের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হলেন।

এই অবস্থা দেখে ইয়াহূদী ও মুশরিক সম্প্রদায়ের মাথায় যেন বজ্রপাত ঘটলো। তারা তড়িঘড়ি করে অন্যান্য অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্য স্থির করলো। নামমাত্র মুসলিম নেতৃবৃন্দকে অধিকাংশ মুসলিম দেশের শাসকের আসনে বসিয়ে তাদেরই মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের ওপরে শুরু করা হলো অবর্ণনীয় লোমহর্ষক নির্যাতন। এক পর্যায়ে ইখাওয়ানুল মুসলিমীনের অসংখ্য নেতাকর্মীসহ ইমান বান্না (রাহঃ)-কে হত্যা করা হলো এবং আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)-কে কারারুদ্ধ করে ফাঁসীতে ঝুলানোর আয়োজন করা হলো। মহান আল্লাহর মেহেরবাণী, ইসলামের দুশমনরা আল্লামা মওদুদী (রাহঃ)-কে ফাঁসী দিতে পারেনি। সারা দুনিয়াব্যাপী অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলমানরা যেভাবে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে, তা জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টারই ফসল।

ইতোমধ্যে রাশিয়ায় গর্বাচেভ প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই সমাজতন্ত্র নিজ জন্মভূমিতে আত্মহত্যা করে যাদুঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। দুনিয়ায় একক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো আমেরিকা ও ইয়াহূদী সৃষ্ট পূজিবাদ। ইতোপূর্বেই মানব প্রেমিক চিন্তাবিদগণ মানব রচিত সকল মতবাদ-মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মানুষকে শান্তি দিতে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

বর্তমানেও পূজিবাদকে মোকাবেলা করার মতো কোনো আদর্শের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই এবং এর সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে পূজিবাদ নামক দানবের কবল থেকে মানবতাকে উদ্ধার করার ক্ষমতাও কোনো আদর্শের নেই।

পূজিবাদ নামক এই দানবের পরিচালকদের এ কথা ভালোভাবেই জানা রয়েছে যে, যে কোনো ধরনের মতবাদ-মতাদর্শের মোকাবেলা করতে পারে একমাত্র ইসলাম এবং পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর বাণী, এ কথাও বর্তমান বিজ্ঞান প্রেমিক লোকদের কাছে বিজ্ঞানই প্রমাণ করে দিয়েছে। আল্লাহর কোরআনই শান্তির স্রোতধারা বইয়ে দিতে সক্ষম এবং এই কোরআন ব্যতীত বিশ্বমানবতার মুক্তির দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই, এ কথা বর্তমান পৃথিবীর চিন্তানায়কগণ প্রকৃতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু ইয়াহূদী-মুশরিক ও তাদের দোসররা ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে দুনিয়াব্যাপী বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছে তাদেরই গুরু আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই কথা, 'তুমি সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পারো এবং কিছু মানুষকে সবসময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা তোমার পক্ষে হয়ত সম্ভব, কিন্তু তুমি সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পারো না।'

ইয়াহূদী সন্ত্রাসী ও ইসলামের অন্যান্য দুশমনদের সকল কৌশল ইনশাআল্লাহ ব্যর্থ হবে, তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ইসলাম পুনরায় তার নিজস্ব আলোয় দুনিয়া আলোকিত করে তুলবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। মানুষকে কিছু সময়ের জন্য তারা বোকা বানিয়ে অন্ধকারে রাখলেও এই অন্ধকারের পর্দা ছিন্ন করেই প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম কৌশল- দলাদলি সৃষ্টি

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইয়াহূদীরা মুসলমানদের দুর্বল করার জন্য ইসলাম সম্পর্কে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলো, তাহলো কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করবে। তারা নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের কাছে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এরপর মূল কাজ হবে কোরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের প্রতি বিরাগ ভাজন করা এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি করে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া।

মুসলমানদের অসতর্কতার সুযোগে ইয়াহূদী সন্ত্রাসীরা এ কাজে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে। সাধারণ মুসলমান দূরে থাক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম হিসেবে যারা সাধারণ মুসলমানদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র, তাদের অজান্তেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও পথ ও মতের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে সুকৌশলে আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করেছে। ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কাদরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, খাল্‌ক-ই কোরআন, ওয়াহ্‌দাতুল ওয়াজুদ ও সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহী ইয়াহূদী আর মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের ফসল। শুধুতাই নয়, নবুওয়াতের মতো মীমাংসিত ও স্পর্শ কাতর বিষয়েও তারা বিতর্কের অবতারণা করিয়ে তাদের পোষ্য গোলামদের দিয়ে নবুওয়াতের দাবি করিয়েছে। সৃষ্টি করেছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও বাহাইসহ অন্যান্য সম্প্রদায়কে।

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তাদের এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপের মোকাবেলায় হক্কানী আলেম, পীর-মাশায়েখগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে অধিকাংশ মুসলিম দেশে এসব ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করিয়েছেন। ষড়যন্ত্র করে আলেম-ওলামাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করলেও বর্তমানে ক্রমশ সে ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে এবং আলেম-ওলামা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করছেন।

দ্বিতীয় কৌশল- বিভ্রান্তি সৃষ্টি

এরপর তারা কৌশল অবলম্বন করলো পবিত্র কোরআন, নবী-রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য অভিশপ্ত ইয়াহূদী গোষ্ঠী প্রথমে সওয়ার হলো বৃটেনের খৃষ্টানদের ঘাড়ে। সে সময় বৃটেন সারা দুনিয়া দখল করে কলোনী স্থাপন করেছে। ইয়াহূদীরা বৃটেনের মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার কারিকুলাম প্রণয়ন করলো। এই কারিকুলামে সুকৌশলে তারা কোরআন-হাদীস, নবী-রাসূল ও ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবার মতো উপকরণ সাজালো। যেনো মুসলিম শিক্ষার্থীগণ শিক্ষাঙ্গন থেকেই নাস্তিক হয়ে বের হয় এবং অমুসলিমদের স্বার্থেই এসব শিক্ষিত মুসলমান (?) কাজ করে।

পবিত্র কোরআন, নবুওয়াত-রিসালাত সম্পর্কে ভিত্তিহীন প্রশ্ন তুলে নানা ধরনের কবিতা-সাহিত্য রচিত হলো। মানব সভ্যতায় মুসলমানদের যাবতীয় অবদান আড়াল করে রচিত হলো ইতিহাস। অমুসলিমদের অখ্যাত-অপরিচিত লোকদের বানানো হলো চিন্তানায়ক আর বিখ্যাত মুসলিম চিন্তানায়কদের নাম পর্যন্ত মুছে দেয়া হলো।

একান্ত বাধ্য হয়ে যেসব মুসলিম মনীষীদের নাম ইতিহাসে লেখা হলো, সে নামও এমন বিকৃত করে লেখা হলো, তা পাঠ করলে সে ব্যক্তি মুসলিম না অমুসলিম বোঝার উপায় রইলো না।

কবিতা-সাহিত্যে, নভেল-নাটক, মূকাভিনয় ও চলচ্চিত্রে ইসলামকে উগ্র সন্ত্রাসী মতবাদ আর সাহাবায়ে কেরামকে রক্ত পিপাসু হিসেবে উপস্থাপন করা হলো। ইসলামের বিরুদ্ধে কার্টুনের নামে নানা ধরনের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা হলো। এমনকি মুসলিম নাম ব্যবহার করে ইসলাম দরদীর ছদ্মাবরণে নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরামের বিভ্রান্তিকর জীবনী লেখা হলো এবং পবিত্র কোরআন-হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা হলো। নিকট অতিতে সালমান রুশদী নামক জাহান্নামের এক কীটকে দিয়ে 'স্যাটানিক ভার্সেস' তারাই লিখিয়েছে।

'জিহাদ'-এর প্রকৃত অর্থ গোপন করে এর অর্থ করা হলো 'ধর্মযুদ্ধ' এবং জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো যে, ইসলাম তরবারীর জোরে তথা শক্তি প্রয়োগ করে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে। ইসলামকে ইসলাম হিসেবে উল্লেখ না করে উল্লেখ করা হলো 'মোহামেডানিজম' বা মুহাম্মাদের মতবাদ। অর্থাৎ তারা এ কথাই বুঝাতে চাইলো যে, ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া আদর্শ নয়, এটা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তৈরী তথা অন্যান্য মতবাদের মতো এটিও একটি মানব রচিত মতবাদ।

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম নবী-রাসূল হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের আগমন ঘটেছে। প্রত্যেক নবী-রাসূলের আদর্শই ছিলো ইসলাম। অথচ এরা প্রচার করে থাকে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সাঃ)। এভাবে নানা দিক থেকে ইয়াহূদী এবং তাদের দোসররা ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করলো।

তৃতীয় কৌশল- ইসলামপন্থীরা সন্ত্রাসী

ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনদের সকল কৌশল বর্তমানের মতো অতিতেও ব্যর্থ হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ-

এ মূর্খ লোকেরা তাদের মুখের এক ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের মশাল নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ আলোর পূর্ণ বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফিরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর! (সূরা তওবা-৩২)

এ যাবৎ কাল দুশমনরা যত কৌশল অবলম্বন করেছিলো, তা ব্যর্থ হবার পরে তারা গত শতাব্দীর শেষলগ্ন থেকে নতুন এক কৌশল অবলম্বন করলো। মুসলিম নামধারী আল্লাহ্ ভীতিহীন লোভী, স্বার্থান্ধ, দুনিয়া পূজারী, স্থবির চিন্তার অধিকারী, অর্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কোরআন-হাদীসের জ্ঞান বিবর্জিত, ইসলামের ইতিহাস অনভিজ্ঞ, ইসলামী দাওয়াত ও বিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ, নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামদের আন্দোলনের ধারা পরিক্রমা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং ইসলামের দরদী সেজে ভুল বুঝানো শুরু করলো।

এসব লোকদের বুঝানো হয়, 'মুসলিম দেশগুলোয় যে পদ্ধতিতে সরকার পরিচালিত হচ্ছে তা হারাম। গনতন্ত্র, নির্বাচন, ভোট, হরতাল, ধর্মঘট, মিছিল-মিটিং ইত্যাদি হারাম। বিজ্ঞানের অবদানে যেসব প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে এসব ব্যবহার করাও হারাম। গনতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়ে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার কথা যারা বলে, তারা ভুল কথা বলে। নবী-রাসূলগণ এসব পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। ইসলামের কথা বলার জন্য যারা ক্যামেরায় ছবি ধারণ করে এবং টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা করে, তারা দুনিয়া পূজারী, এসব লোকদের পেছনে নামায আদায় করা হারাম। কারণ নবী-রাসূলগণ ক্যামেরায় ছবি তুলেননি এবং টিভি চ্যানেলে বক্তৃতাও করেননি। আদালতে বিচার কাজে মানুষের বানানো আইন প্রচলিত রয়েছে, যারা এই আইন দিয়ে বিচার করে তারা কাফির এবং এদেরকে হত্যা করতে হবে। এসব লোকদের হত্যা করলে আল্লাহ্ খুশী হবেন এবং খুব সহজেই জান্নাত পাওয়া যাবে। ইসলামের দুশমনদের হত্যা করতে হবে এবং এদের যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস করে দিতে হবে। মুসলিম দেশের শাসকদের হত্যা করতে হবে, কারণ এরা ক্ষমতায় থেকে সুযোগ পেয়েও ইসলামী আইন চালু করছে না। এরা কাফিরের থেকেও নিকৃষ্ট। এসব লোকদের হত্যা করতে গিয়ে নিজে নিহত হলে আল্লাহর কাছে শহীদের মর্যাদা লাভ করা যাবে।'

উল্লেখিত কথাগুলো যাদের সম্মুখে বলা হয়, তারা অর্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত হলেও মুসলমান। হৃদয়ে আল্লাহ্-রাসূলের প্রতি অসীম ভালোবাসা রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার, শহীদের মর্যাদা পাবার এবং অতি সহজেই জান্নাত লাভের সহজ পদ্ধতি সম্মুখে আসার সাথে সাথে এসব নির্বোধ লোকগুলো জান্ কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

মুসলমানদের মধ্য থেকে উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের ব্যবহার করছে ইয়াহূদী-মুশরিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। ক্ষেত্র বিশেষে স্বয়ং নিজেরাও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড

প্রত্যক্ষভাবে করছে। এসব দাড়ি-টুপি পরিহিত লোক বা মাদ্রাসা পড়ুয়া লোকদের মাধ্যমে আল্লাহর আইন বা বিধান কায়েমের ধুয়া তুলে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে তারা বর্তমানে তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।

(১) সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে ইসলামপন্থী ও ধর্মভীরু মানুষের প্রতি সন্দেহ-সংশয় এবং ঘৃণা সৃষ্টি করা।

(২) নবী-রাসূলদের ধারা অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যেসব ইসলামী দল আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে, তাদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি, ইসলামী দলের সাথে সাধারণ মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি, সরকারকে ইসলামী দলগুলোর ওপর জুলুম-নির্যাতনে উৎসাহিত করা এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া।
(৩) ইসলামপন্থীদের প্রতি সন্দেহ-সংশয় ও ঘৃণা সৃষ্টি করে ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শ বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষদের প্রতি সাধারণ মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তোলা এবং তাদেরকেই মুসলিম দেশসমূহে ক্ষমতায় আসীন করা।

সন্ত্রাসী তৎপরতা- মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ

বর্তমান পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য কোনো সংবাদ মাধ্যম মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত নয়। কারণ ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, সন্ত্রাসী ইয়াহূদী গোষ্ঠী বহুপূর্ব থেকেই সারা পৃথিবীব্যাপী সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করে একযোগে সিন্ডিকেট সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। এ কারণেই পৃথিবীর যেখানেই সন্ত্রাসী তৎপরতা ঘটছে, সাথে সাথে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম একযোগে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করে সংবাদ প্রচার করছে। মহাসমুদ্রে একফোটা পানি নিক্ষেপ করলে তা যেমন মিশে যায়, তেমনি সিন্ডিকেট সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত ভিত্তিহীন মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করলেও তা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। মুসলমানদের শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম থাকলে তার মাধ্যমে প্রতিবাদ করে সারা দুনিয়ার কাছে মুসলমানরা নির্দোষ- বিষয়টি তুলে ধরা যেতো।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপরে হামলা করে এর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলমানদের ওপরে। এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর ইসলামী আন্দোলনসমূহকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে ইয়াহূদী প্রভাবিত আমেরিকা আফগানিস্থানে হামলা করে সরকারকে উৎখাত করলো। সভ্য জগতের সমস্ত নিয়ম-নীতি পদদলিত করে পবিত্র রমজান মাসে এবং ঈদের দিনেও অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করলো। তাদের প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী

ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালালো। এই ঘটনার পেছনেও ইয়াহূদীদের চক্রান্ত সক্রিয় ছিল। কারণ যেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হলো, সেদিন সেখানে একজন ইয়াহূদীও তাদের কর্মস্থলে যোগ দেয়নি। অথচ প্রায় চারহাজার ইয়াহূদী সেখানে চাকরী করতো।

ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হলো, সম্পূর্ণ দৃশ্য ভিডিও করে সমস্ত প্রচার মাধ্যমে একযোগে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হলো। এ ধরনের একটি মারাত্মক ঘটনার সম্পূর্ণ দৃশ্য যারা ভিডিও করলো, তারা ঘটনার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবহিত না থাকলে যাবতীয় দৃশ্য ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করলো কিভাবে? অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের দ্বারা এ ঘটনা সংঘটিত হবার অসংখ্য প্রমাণ মওজুদ থাকার পরও তাদের প্রতিপালক ইসলাম বিদ্বেষী আমেরিকা ইয়াহূদীদের পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত দোষ ইসলামপন্থীদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ারের মতই নির্বিচারে গনহত্যা চালালো এবং স্বাধীনতাকামী মুসলিম সংগঠন, সেবামূলক মুসলিম সংগঠনসহ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দলগুলোকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করলো।

ফ্রান্স, লন্ডন ও ভারতে বোমাবাজি করিয়ে সেই একই কৌশলে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করা হলো। মুসলিম নামের অধিকারী যেসব লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞান প্রাথমিক পর্যায়ের। কারা তাদেরকে এই ঘটনা ঘটাতে উৎসাহিত করেছে, কারা অর্থ সরবরাহ করছে, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি– প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে, যথাযথ পন্থায় তদন্ত করলে অবশ্যই পর্দার আড়ালে লুকায়িত নাটের গুরুদের চেহারা দুনিয়াবাসীর সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে প্রশ্ন হলো, বিশ্বব্যাপী এ সন্ত্রাসী অপতৎপরতার তদন্ত করবে কে? তদন্তের দায়-দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছে, তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ। ইসলাম আর মুসলিম নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই যাদের গাত্রদাহ শুরু হয় কখনোই তারা সঠিক পথে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের চেহারা দুনিয়ার সামনে তুলে না ধরে মুসলমানদের নামই উচ্চারণ করবে।

ইসলামের 'ধৈর্য ধারণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন' নির্দেশ যদি কোনো মুসলমান অমান্য করে অধিকার আদায়ের জন্য সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে, তাহলে এটাও তো খতিয়ে দেখতে হবে, কেনো সে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করলো।

সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে, নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে, নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, মুসলিম দেশ দখল করা হচ্ছে, সম্পদ বিনষ্ট ও দখল করা হচ্ছে, নিত্য-নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার করে তা

মুসলমানদের ওপরে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে 'ধৈর্যহারা' কোনো মুসলমান যদি আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে, তাহলে কি তাকে সন্ত্রাসী বলা যাবে?

এ সম্পর্কে স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ আবু জাফর সাহেব তাঁর রচিত 'অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা' নামক গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় আকর্ষনীয় দৃষ্টান্ত দিয়ে খুবই সুন্দর কথা উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'অসংখ্য ফুলে-ফুলে পরিভ্রমণ করে বহু পরিশ্রমে মৌমাছি তার মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে রাখে। নির্দয় দস্যুর মতো বাওয়ালি (যারা মধু সংগ্রাহক) যখন মৌচাকে হানা দেয়, ক্ষুব্ধ রাগান্বিত মৌমাছি তার মধু ও মৌচাক রক্ষার্থে যদি বাওয়ালিকে দংশন করে, সেটা কি সন্ত্রাস? আসলে কে সন্ত্রাসী? দস্যু বাওয়ালি, নাকি বিক্ষুব্ধ মৌমাছি? কী অদ্ভূত পরিহাস! পাশ্চাত্যের বাওয়ালিরা মুসলিম বিশ্বের সর্বস্ব লুণ্ঠনে মেতে উঠবে, তারা নিষ্পাপ নিরপরাধ! আর যারা আত্মরক্ষার্থে আত্মহুতি দিচ্ছে, তারা সন্ত্রাসী! বিচারের কী অকথ্য অদ্ভূত মানদন্ড, যা দেখে ইবলিসও লজ্জা পায়।' এক বিখ্যাত উর্দুভাষী কবি বলেছেন–

وہ قتل بھی کرتے چرچا نہی ہوتا

ہم آہ بھی کرتے بدنام ہوجاتا

ও কতল ভি করতি চর্চা নাহি হোতা

হাম আহ্ ভি করতি বদনাম হো জা তা।

সে খুন করে কিন্তু এ ব্যপারে কেউ তার সমালোচনাও করে না। আহত হয়ে যন্ত্রণা কাতর শব্দ আমার মুখে উচ্চারিত হলেই চারদিকে আমার দুর্ণাম ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়াহূদী সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলিম রাষ্ট্র ফিলিস্তিন দখল করার পূর্বে ও পরে ইয়াহূদীরা অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে মুসলমানদের রক্তে প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। এখনও প্রতিদিন সেখানে মুসলিম নারী, শিশু-কিশোর ও যুবকদের হত্যা করছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও হামাসের প্রথম সারির কয়েকজন সম্মানিত নেতাকে সন্ত্রাসী কায়দায় হত্যা করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের এসব জঘন্য কার্যকলাপকে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় আনা হচ্ছে না। আত্মরক্ষার্থে মুসলমানরা যদি একটি ঢিলও ছুড়ে, সাথে সাথে একে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

অভিভাবক, খতীব, ওয়ায়েজীন ও ইমামগণের দায়িত্ব

বর্তমানে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে শত্রুপক্ষ যে কৌশলে অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তা প্রতিহত করা একমাত্র সরকারেরই দায়িত্ব নয়। দেশের জনগণকে নিজেদেরই স্বার্থে এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন হতে হবে এবং শত্রুদের দমন করার জন্য সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। এ ব্যাপারে দল, মত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিককেই এগিয়ে আসতে হবে। 'আমার পসন্দের দল সরকারে নেই, সুতরাং সরকারের দুর্নাম হলে আমার কিছুই যায় আসে না' এই মনোভাব ত্যাগ করতে হবে। যান-বাহনে বা স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে এতে শুধু সরকারী দলের লোক বা সরকারী দলের সমর্থক লোকদের সন্তানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সকল শ্রেণীর মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিকালে 'দল প্রেম নয়' দেশ প্রেমিক হিসেবে সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করতে হবে।

অভিভাবকগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সন্তান কি করছে কোথায় যাচ্ছে এবং কোন্ শ্রেণীর লোকদের সাথে মেলামেশা করছে। দল হিসেবে সন্তান, ভাই, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অধিনস্থ কর্মচারী কোন্ দলকে পসন্দ করছে। ইসলামের নামে কোনো ব্যক্তি কাউকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কে কোন্ ধরনের বই-পত্র পড়ছে, ফোনে আভাষে-ইঙ্গিতে জাতিসত্তা, সরকার ও দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো আলোচনা করছে কিনা এ ব্যাপারে অভিভাবকগণকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

অভিভাবকগণ যদি অনুভব করেন যে, তার সন্তান, ভাই, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কেউ অথবা অধীনস্থ লোকদের কেউ ইসলামের লেবাসধারী হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো সংগঠনের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাহলে তাকে প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী দল সম্পর্কে বুঝিয়ে ঐসব সন্ত্রাসবাদী-জঙ্গীবাদী সংগঠনের ছোবল মুক্ত করতে হবে। আর যদি বুঝা যায় যে, আদর-ভালোবাসা দিয়ে, চেষ্টা-সাধনা করেও এদেরকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরানো যাবেনা, তাহলে মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে, সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থে এদেরকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিন। মনে রাখবেন, আপনার অধীনস্থদের ব্যাপারে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لاَ يَسْتَرْعِىْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ اَوْكَثُرَتْ اِلاَّ

سَأَلَه اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهَايَوْمَ الْقِيمَةِ اَقَامَ فِيْهَا اَمْرَاللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَمْ اَضَاعَه حَتّٰى يَشَاءَ لَه عَنْ اَهْلِ بَيْتِه خَاصَّةً-

আল্লাহ যে বান্দাকেই বেশী অথবা কম লোকের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন, কিয়ামতের দিন অবশ্যই তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, সে অধীনস্থ লোকদের দ্বীনের ওপর চালিয়েছিলো না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। বিশেষ করে তার বাড়ির পরিবারের লোকদের ব্যাপারেও হিসাব গ্রহণ করবেন।

মায়া-মমতা ও ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে আপনজনদেরকে যদি ধ্বংসের পথ থেকে ফিরানো না হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন এরা যখন জাহান্নামে যাবে তখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলবে, যারা আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়নি, ভুল পথে চলতে দেখেও নিষেধ করেনি, তারা আজ কোথায়? তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে পিষে তারপর জাহান্নামে যাবো। তারা যা বলবে, পবিত্র কোরআনে সে কথাগুলো এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ-

আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (সূরা হামীম আস্ সাজ্‌দাহ্-২৯)

শিক্ষকগণ অভিভাবকদের বড় অভিভাবক। তাঁরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় ছাত্রদেরকে বুঝাবেন, 'আল্লাহর আইন চালুর নামে যারা সন্ত্রাস করছে তারা আসলে আল্লাহর আইনের দুশমন। ইসলামের শত্রুদের হাতের পুতুল হিসেবেই তারা কাজ করছে। ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের স্থান নেই এবং ইসলাম সবসময় নিয়মতান্ত্রিক পন্থাই অনুসরণ করে। আদালতে বোমা মেরে বিচারক হত্যা করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করে বিদেশী আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।'

সম্মানিত খতীব, ইমাম ও ওয়ায়েজীনগণকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এভাবে যদি ইসলামের নামে শত্রুপক্ষ সন্ত্রাস চালাতে থাকে, তাহলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকগুলো ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষন করবে। আর এ জন্য আল্লাহর দরবারে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদেরই দায়ী হতে হবে। আলেম সমাজই ইসলাম

সম্পর্কে সবথেকে বেশী জ্ঞান রাখেন এবং আল্লাহর আদালতে কোন্ কোন্ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে, এ ব্যাপারেও তাঁরা পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে সচেতন না করলে আল্লাহর আদালতে সর্বাগ্রে আলেমদেরই জবাবদিহি করতে হবে, এ ব্যাপারেও আলেম সমাজ সচেতন রয়েছেন।

যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী মাহফিলে বক্তৃতা করেন, তাঁরা কোরআন-হাদীস দিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন এবং ইসলামী জীবন বিধান শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরবেন। খতীব ও ইমামগণ সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ জুমাবারে অনেক লোক সম্মুখে পেয়ে থাকেন। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে খুতবায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আলোচনা করে মানুষকে সচেতন করুন। তাদেরকে এ কথা বুঝান, যারা আল্লাহর আইন চালুর নামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পিতামাতাকে সন্তানহারা করছে, স্ত্রীকে স্বামীহারা করছে, সন্তানকে ইয়াতিম করছে, বোনকে ভাইহারা করছে, পরিবারের উপার্জনশীল একমাত্র ব্যক্তিকে হত্যা করে গোটা পরিবারকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে, তারা অবশ্যই ইসলাম, মুসলমান, দেশ-জাতি ও সমগ্র মানবতার দুশমন। এদের সন্ধান পাওয়া মাত্র আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফোন করে ধরিয়ে দিয়ে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

মনে রাখবেন, বোমাবাজরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে নেমেছে, তারা যদি আংশিকও সফল হয়, তাহলে এর প্রথম শিকার আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ তথা ইসলাম পন্থীদেরকেই হতে হবে। দেশের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে, কারাগারগুলো আলেম-ওলামা দিয়ে পরিপূর্ণ করা হবে, সংবিধান থেকে বিস্‌মিল্লাহ উঠিয়ে দেয়া হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটুবাক্য প্রয়োগ করে কবিতা-সাহিত্য রচনা করা হবে, ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে, মুসলমানদের কলিজা পবিত্র কোরআনের অবমাননা করা হবে, কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের হেয়-প্রতিপন্ন করা হবে এবং আলেম-ওলামাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে ভয়াবহ এই পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে উত্তরণের তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন– ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ
দমনে
ইসলাম
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী